১০০ ১৯১৩-২০১৩ 1913-2013
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

The Ahmadi Fortnightly

নব পর্যায় ৭৬ বর্ষ | ৪র্থ সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৬ ভাদ্র, ১৪২০ বঙ্গাব্দ | ২২ শাওয়াল, ১৪৩৪ হিজরি | ৩১ জহুর, ১৩৯২ হি. শা. | ৩১ আগষ্ট, ২০১৩ ঈসাব্দ

Jalsa Salana UK 2013

UK CENTENARY 1913 - 2013 Ahmadiyya Muslim Community

যুক্তরাজ্যের ৪৭তম আন্তর্জাতিক সালানা জলসা ২০১৩ মুবারক হোক

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন

LOVE FOR ALL, HATRED FOR NONE

veronica
tours & travels

Muhammad Belal Ahmad (Tushar)
ceo

Travel Agent & Tour Operator

VERONICA TOURS & TRAVELS
207/2, West Kafrul, Begum Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207
Phone: 88 02 9113176, Cell: 01733 004412, 01552 403395, E-mail: veronica@ithbd.com, tusharith@gmail.com
Our Sister Concern:
International Trading House (Garments Accessories Supplier),Hafsa Fashion Ltd. (Readymade Garments Manufacturer)
Awl Fashion (Buying Office), Color Clouds (Arts & Craft House), Bakers Bay (Bakery & Sweets)

Amecon
Since 1983
www.amecon-bd.net

Our Activities
- Crest
- Trophy
- Sign Board
- Metal Sign
- Acrylic Letter
- POP & Interior
- Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536
H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

সম্পাদকীয়

আন্তর্জাতিক সালানা জলসা–২০১৩ সফল হোক

মহান আল্লাহ্ তা'লার আশিস ও অনুগ্রহক্রমে ৩০, ৩১ আগষ্ট ও ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তিনদিন ব্যাপী যুক্তরাজ্যের আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ৪৭তম আন্তর্জাতিক সালানা জলসা ২০১৩, হাদীকাতুল মাহদী-তে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহুতা'লা বিনাসরিহিল আযীয-এর পবিত্র সত্তার উপস্থিতিতে আন্তর্জতিক জলসার রূপ পরিগ্রহ করে। মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া ইন্টারন্যাশনাল শক্তিশালী নেট ওয়ার্কের মাধ্যমে এ জলসার অনুষ্ঠান সারা বিশ্বের পাঁচটি মহাদেশ জুড়ে Live telecast করে। প্রায় ২৫ কোটি আহমদীসহ গোটা বিশ্ববাসী এবারও তা প্রত্যক্ষ করবে, ইনশাআল্লাহ্।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের জলসা এখন বিশ্বরূপ ধারণ করেছে। বিশ্বের দুই শতাধিক দেশের প্রতিনিধিবর্গ এই জলসায় অংশগ্রহণ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের জলসা রাজনৈতিক কোন সমাবেশ নয় তেমনি পার্থিব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন আনুষ্ঠানিক সম্মেলনও নয়।

আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আলাইহেস সালাম-এর খলীফার পবিত্র সান্নিধ্য-সংস্পর্শ ও তাঁর আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ নসিহতমূলক জীবন-প্রদায়ী পবিত্র কালাম শুনার জন্য মধুমক্ষিকার ন্যায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পাগলপারা পিপাসার্ত লোকেরা প্রবল বাসনায় এই জলসায় সমবেত হয়ে থাকেন।

যুক্তরাজ্যের এই জলসায় যুগ খলীফার প্রেম-প্রীতিপূর্ণ সহাস্য-বদন অবলোকনে আর তাঁর মুখ:নিসৃত আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের পবিত্র কালাম শ্রবণে তারা ধন্য হোন। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ থেকেও অনেকে এই জলসায় অংশগ্রহণ করছেন। আমাদের দেশ থেকে এই মহতি জলসায় যারা অংশগ্রহণ করছেন, হুযূর (আই.)-এর পবিত্র সাহচর্যে তারা ধন্য হোন আর আমাদের জন্য হুযূরের আশিসপূর্ণ সওগাত বয়ে নিয়ে আমাদের মাঝে সহি সালামতে প্রত্যাবর্তন করুন, পরম করুণাময়ের সমীপে এটাই আমাদের কামনা।

হুযূর (আই.) জলসার বিভিন্ন অধিবেশনে আশিস বিতরণকারী মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করবেন। রবিবার ১ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬ টায় আন্তর্জাতিক বয়আত অনুষ্ঠিত হবে। সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হবে সেই দিন রাত ৯ টা ৩০ মিনিটে।

জলসার সব অনুষ্ঠানমালা MTA-তে সরাসরি দেখে আমরা হুযূর (আই.)-এর পবিত্র দর্শন লাভ করব ইনশাআল্লাহ্।

এই জলসার সার্বিক সফলতার জন্য মহান আল্লাহ্ তা'লার সমীপে আমাদের সকরুণ দোয়া নিবেদন করছি। সেই সাথে সকলের প্রতি নিবেদন, জলসার পুরো অনুষ্ঠান মনোযোগের সাথে এমটিএ-তে দেখুন এবং নিজেকে প্রকৃত ও খাঁটি ইসলামের আলোকে গড়ে তুলুন।

আল্লাহ্ তা'লা মহতী এই জলসায় উপস্থিত ও অনুপস্থিত সকলকেই এর অশেষ কল্যাণে অনুগৃহীত করুন, আমীন।

সূচিপত্র

৩১ আগষ্ট, ২০১৩

কুরআন শরীফ	২
হাদীস শরীফ	৩
অমৃত বাণী	৪
হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)- এর ভ্যাঙ্কুভার, ব্রিটিশ কলাম্বিয়া, কানাডার বাইতর রহমান মসজিদে প্রদত্ত **জুমুআর খুতবা** (১৭ মে ২০১৩)	৫
খেদমতে খালক মওলানা মাহমুদ আহমদ	১২
রূপক বর্ণনার অন্তরালে মুহাম্মদ খলিলুর রহমান	১৪
বাইবেলের শিক্ষা বনাম খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস মুহাম্মদ খলিলুর রহমানখন্দকার আজমল হক	১৯
আমাদেরকে সত্য ও সঠিক পথে চালিত কর সরফরাজ এম এ সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী	২২
জান্নাতি বাতাস বইয়ে যাক সারা বছর মাহমুদ আহমদ সুমন	২৪
উম্মী নবী (সা.)-এর গোলাম উম্মতী নবী (আ.) ডা: শেখ হেলাল উদ্দীন আহমদ	২৬
কুরআন ও প্রযুক্তি আঁখি আহমদ	২৮
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত– একটি পর্যালোচনা মুহাম্মদ আব্দুস সালাম	২৯
পাঠক কলাম	৩০
PROGRAMME 47th JALSA SALANA 2013 (Annual Convention) U.K.	৩২
সংবাদ	৩৪
বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী	৩৬

কুরআন শরীফ

সূরা ইবরাহীম-১৪

اَلَمۡ تَرَ اِلَى الَّذِيۡنَ بَدَّلُوۡا نِعۡمَتَ اللّٰهِ كُفۡرًا
وَّاَحَلُّوۡا قَوۡمَهُمۡ دَارَ الۡبَوَارِ ﴿۲۹﴾

২৯। তুমি কি তাদের লক্ষ্য করনি, যারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে অকৃতজ্ঞতায় বদলে দিল এবং নিজ জাতিকে ধ্বংসের গৃহে (টেনে) নামালো,

جَهَنَّمَ ۚ يَصۡلَوۡنَهَا ؕ وَبِئۡسَ الۡقَرَارُ ﴿۳۰﴾

৩০। (অর্থাৎ) জাহান্নামে। তারা সেখানে প্রবেশ করবে এবং তা অতি নিকৃষ্ট অবস্থান (স্থল)।

وَجَعَلُوۡا لِلّٰهِ اَنۡدَادًا لِّيُضِلُّوۡا عَنۡ سَبِيۡلِهٖ ؕ
قُلۡ تَمَتَّعُوۡا فَاِنَّ مَصِيۡرَكُمۡ اِلَى النَّارِ ﴿۳۱﴾

৩১। আর তারা আল্লাহ্‌র সাথে সমকক্ষ স্থির করেছে যেন তারা তাঁর পথ থেকে (লোকদের) বিচ্যুত করতে পারে। তুমি বল, 'তোমরা সাময়িকভাবে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে নাও। এরপর নিশ্চয় আগুনের দিকেই হবে তোমাদের যাত্রা'।*

قُلۡ لِّعِبَادِىَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا يُقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ
وَيُنۡفِقُوۡا مِمَّا رَزَقۡنٰهُمۡ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنۡ
قَبۡلِ اَنۡ يَّاۡتِىَ يَوۡمٌ لَّا بَيۡعٌ فِيۡهِ وَلَا خِلٰلٌ ﴿۳۲﴾

৩২। আমার যেসব বান্দা ঈমান এনেছে তুমি তাদের বল, 'যেদিন কোন ক্রয়বিক্রয় হবে না এবং কোন বন্ধুত্ব (কাজে আসবে না) সেদিন আসার আগেই তারা যেন নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং আমরা তাদের যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে।'

*['মাসীর' শব্দের এ অনুবাদের জন্য ইমাম রাগেবের মুফরাদাত দ্রষ্টব্য। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে.) কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দেখুন)]

হাদীস শরীফ

পিতা-মাতার অবাধ্যতা ও মিথ্যাচারিতা মহাপাপ

কুরআন ঃ

"তোমরা মূর্তিপূজার শির্‌ক থেকে বাঁচো এবং মিথ্যা থেকে দূরে থাকো।" (সূরা হজ্জ ঃ ৩১)

হাদীস ঃ

হযরত আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "আমি কি তোমাদের তিনটি বড় গুনাহ্ সম্বন্ধে অবগত করবো? আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি বলুন, তিনি (সা.) বললেন, আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা এবং পিতা মাতার অবাধ্যতা করা, তিনি (সা.) তখন হেলান দিয়ে বসেছিলেন, সোজা হয়ে তিনি বসলেন এবং বললেন, খবরদার মিথ্যা কথা বলা থেকে বাঁচো । তিনি (সা.) এ কথাটি পুণঃ পুণঃ উচ্চারণ করতে লাগলেন। এতে আমরা বললাম, হায়! যদি তিনি (সা.) চুপ করে যেতেন" (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ

ইসলাম মানবজাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের সকল রাস্তাকে পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরে মানবজাতিকে খোদার নিকট পৌঁছে দিতে চায়। পবিত্র কুরআন এ সম্পর্কে আমাদেরকে জানাচ্ছে, মূর্তিপূজা ও মিথ্যাচারিতা ও পিতামাতার অবাধ্য হওয়া তিনটি বড় গুনাহ্ মানুষকে খোদা থেকে দূরে খোদার অসন্তুষ্টির পথে নিয়ে যায় এবং তার আত্মাকে ধ্বংস করে দেয়।

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, অংশীবাদিতা, পিতামাতার অবাধ্যতা ও মিথ্যাচারিতা মহাপাপ। মিথ্যা মানুষের আত্মাকে কলুষিত ও অপবিত্র করে দেয়।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন, বাস্তব কথা হলো এই যে, মানুষ যতক্ষণ না মিথ্যা পরিহার করে ততক্ষণ সে পবিত্র হতে পারে না। দুনিয়ার হীন ব্যক্তি বলতে পারে যে, মিথ্যা ব্যতিরেকে চলা যায় না। এটা এক অযথা কথা। যদি সত্য দ্বারা চলা সম্ভব না হয় তবে মিথ্যা দ্বারা চলা কখনই সম্ভব নয়। পরিতাপ এই যে, হতভাগা লোকেরা আল্লাহ্‌র সম্মান করে না। তারা জানেনা যে, খোদার আশিষ ছাড়া চলা অসম্ভব। তারা মিথ্যা ও অপবিত্রতাকে নিজেদের ত্রাণদাতা ও মা'বুদ মনে করে।

এজন্য আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে মূর্তির অপবিত্রতার সাথে মিথ্যার অপবিত্রতাকেও বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে প্রকৃত পবিত্রতা দান করুন এবং সকলকে মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকার শক্তি দান করুন, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ

মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

মানব জীবনে অজ্ঞতা বদ্ধমূল হয়ে গেলে হোঁচট খাওয়া স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হয়

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

হে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ! খোদা আপনাদের প্রতি করুনা করুন। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন, আমি এমন এক ব্যক্তি যাকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জ্ঞান দান করা হয়েছে। আমার প্রভু প্রতিটি সূক্ষ্ম বিষয়কে বুঝা আমার জন্য সহজ করেছেন আর জীবন-যাত্রার সব সমস্যা থেকে মুক্ত করেছেন। তিনি আমাকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেছেন এবং তাঁর বিশেষ স্নেহের জন্য আমাকে বেছে নিয়েছেন আর আমাকে আমার আমিত্বের গৃহ থেকে মুক্ত করে সংগোপনে তাঁর সুমহান ও বিশাল গৃহ অভিমুখে আমাকে নিয়ে গেছেন। জল-স্থল পাড়ি দিয়ে যখন আমি প্রকৃত ক্বিবলায় পৌঁছলাম এবং তাঁর মনোনীত গৃহ প্রদক্ষিণ করার সৌভাগ্য লাভ করলাম আর আমার বন্ধু ও মূর্তিমান ভালবাসা, প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্‌র স্নেহের সুদৃষ্টি, অন্তরাত্মার প্রখরতা ও আধ্যাত্মিক রহস্যকে বুঝার ক্ষেত্রে যখন আমাকে বিশেষত্ব প্রদান করল আমি তখন আমার পূর্ণ অস্তিত্বকে তাঁর হাতে সঁপে দিলাম।

আমি তাঁর পক্ষ থেকে সব সূক্ষ্ম বিষয় ও আধ্যাত্মিক রহস্যের জ্ঞান অর্জন করেছি। বিভিন্ন মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে তাঁর পক্ষ থেকে আমাকে ব্যুৎপত্তি দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মাঝে বিদ্যমান সব বিবাদের প্রতি আমি আমার মনোযোগ নিবদ্ধ করছি। আমি সব বিতর্কের উৎস ও কারণ সন্ধান করেছি। অনুসন্ধান ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ক্ষেত্র বাদ রাখিনি বরং সুনিশ্চিতভাবে আমি এর মূল খুঁজে বের করেছি। আমি বুঝতে পেরেছি, ***বিবাদ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে মানুষ যে ভুল-ভ্রান্তি করছে, একটি দিককে উপেক্ষা করে অন্য আরেকটি দিককে অবলম্বন করাই হলো এর মূল কারণ। প্রকৃত জ্ঞান ছাড়াই তারা একটি আঙ্গিককে বড় করে দেখে আর এর বিপরীত মতামতকে তুচ্ছ ও খাটো মনে করে। কাঙ্খিত কোন কিছুর ভালবাসায় মত্ত হলে, প্রবৃত্তি এর বিরোধী সব বিষয়কে ভুলে বসে–এই হলো মানবস্বভাবের বৈশিষ্ট্য। তখন সে সহানুভূতিশীলদের সদুপদেশকেও মনোযোগ দিয়ে শুনতে চায় না বরং বেশীর ভাগ সময় তাদের বিরোধিতা করে আর তাদেরকে শত্রু মনে করে। তখন সে তার হৃদয়ের অস্বচ্ছতার কারণে তাদের সান্নিধ্যে যায় না আর তাদের কথাও মন দিয়ে শোনে না।***

এ আত্মিক বিপত্তির নানা কারণ ও হেতু রয়েছে আর বিভিন্ন পথ ও পন্থা দিয়ে এ ব্যাধির অনুপ্রবেশ ঘটে। এর সবচেয়ে বড় কারণগুলো হলো, হৃদয়ের কাঠিন্য, পাপে আসক্তি, পরকালে জবাবদিহিতার প্রতি ঔদাসীন্য এবং প্রতারক ও মিথ্যাবাদী শত্রুদের সাথে সখ্যতা। মানব জীবনে অজ্ঞতা বদ্ধমূল হয়ে গেলে হোঁচট খাওয়া তার স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হয় আর প্রবৃত্তির দাসত্বই তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পরিণত হয়। অতএব আমরা এমন স্থায়ী পদস্খলন থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই যা মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। প্রায়শ এসব বদ-অভ্যাসই মানুষকে বিবাদ-বিতন্ডার সময় গভীর হঠকারিতার পথে ঠেলে দেয়। সত্যান্বেষী ও হেদায়াত সন্ধানী একজন মানুষের জন্য কু-প্রবৃত্তির খাতিরে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হওয়া প্রকৃতপক্ষে জীবননাশী এক বিষ। এ ফাঁদে পতিত মানুষ খুব কমই রক্ষা পায়। কখনও কখনও এসব অসৎ কারণ এবং বিভ্রান্তিকর হেতুগুলো প্রচ্ছন্ন ও দৃষ্টির আড়ালে থাকে।

এসব ব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষ তা দেখতে পায় না আর মনে করে, সে সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত কাজ করছে। সে তড়িঘড়ি করে যখন বিতন্ডায় লিপ্ত হয় আর বিবাদ-বিসম্বাদে ক্রমশ: উগ্র হয়ে উঠে, এমন ক্ষেত্রে প্রায়শই একটি তুচ্ছ ধারণা এবং দুর্বল অভিমতকে জোরালো ও অকাট্য প্রমাণ বলে মনে করে, যার ফলে তার চালচলনে অহংকারীর হাবভাব দেখা যায়। এসব কিছুর কারণ হলো, গভীর মনোযোগের অভাব, অন্তর্দৃষ্টিহীনতা, সত্য-জ্ঞানের স্বল্পতা, সামাজিক কদাচারের দাসত্ব, রিপুর পুরোপুরি বশ্যতা স্বীকার, আধ্যাত্মিক রুচিশূন্যতা, উচ্চাকাঙ্খা সম্পর্কে নৈরাশ্য এবং জড় জগতের প্রতি পূর্ণ আসক্তি এবং এর অন্ধ অনুসরণ-অনুকরণ।

['সির্‌রুল খিলাফাহ্' পুস্তক, বাংলা সংস্করণ পৃষ্ঠা-১৩-১৪]

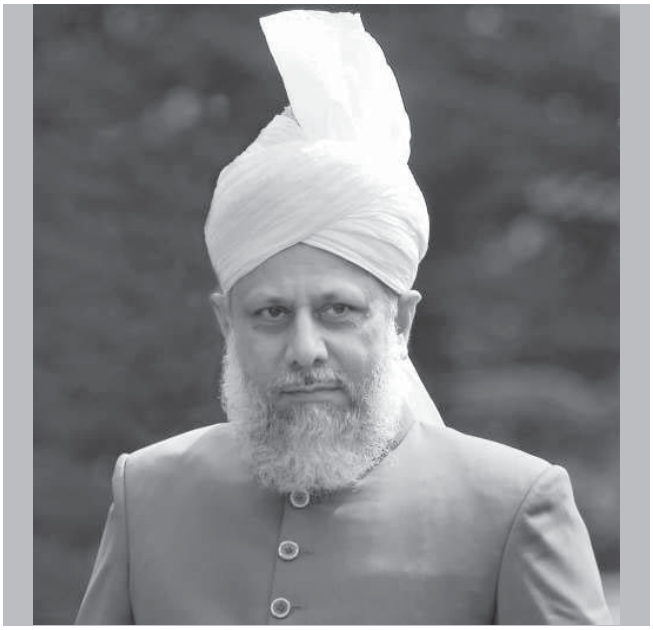

জুমুআর খুতবা

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক ভ্যাঙ্কুভার, ব্রিটিশ কলাম্বিয়া, কানাডার বাইতর রহমান মসজিদে প্রদত্ত ১৭ মে ২০১৩-এর জুমুআর খুতবা।

মসজিদ নির্মাণের মহান উদ্দেশ্যসমূহ

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

"গরিবী হালতে ও ছোট পরিসরে হলেও মসজিদ নির্মান করা জরুরী।"

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿التوبة:١٨﴾

এ আয়াতের অনুবাদ হল, সে-ই আল্লাহ্‌র মসজিদ আবাদ করে যে আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। অতএব অচিরেই তারা হেদায়াত প্রাপ্ত লোকদের অন্তর্ভূক্ত হবে। (সূরা তওবা ১৮)

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় কানাডার ব্রিটিশ কলাম্বিয়া প্রদেশে জামা'তে আহমদীয়া আজ তাদের মসজিদ নির্মানের সৌভাগ্য লাভ করেছে। আপনাদের মাঝে যদিও এমন কিছু পরিবার আছে যারা চল্লিশ বা পঞ্চাশ বছর আগে এখানে এসেছে, আর এখানে পঁচিশ থেকে ত্রিশ বছর যাবাৎ বসবাস করছে এমন পরিবারের সংখ্যাও সম্ভবতঃ অনেক হবে।

এতদসত্বেও এতোদিনে আপনারা মসজিদ নির্মানের সৌভাগ্য লাভ করছেন। এখানে যদিও একটি সেন্টার ছিল যেখানে নামায পড়ার জন্য হল ও মিশন হাউজ ছিল। আর এ জন্যেই হয়তো মসজিদ নির্মানের প্রতি মনোযোগ কম ছিল। (এ সেন্টারের মাধ্যমে) তরবীয়্যতি দিক থেকে এবং জামা'তের লোকদের এক স্থানে একত্রিত হওয়ার দিক থেকে প্রয়োজন যদিও কিছুটা হলেও পূরণ হতো তবুও মসজিদের আলাদা একটি গুরুত্ব আছে। জামা'তের সদস্যদের উপর মসজিদের মিনার, গুম্বজ ও ভবনের আলাদা একটি প্রভাব রয়েছে। আর আশে-পাশের প্রতিবেশী ও অন্যান্যদের ওপরও এর প্রভাব রয়েছে। এর ফলে ইসলামের পরিচিতির নতুন নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়, তবলীগের জন্য নতুন যোগাযোগের ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। এজন্যই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মসজিদ নির্মানের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন।

কেননা এর মাধ্যমে যেখানে জামা'তের একতা প্রতিষ্ঠিত হবে সেখানে তবলীগের

আমাদের উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করা, তাঁর বাণী পৌঁছানো, বেশী বেশী মানুষকে আল্লাহ্‌র একত্ববাদের পতাকাতলে সমবেত করা। নিজের অবস্থা এবং নিজের বংশধরদের অবস্থার মাঝে বিপ্লব সৃষ্টি করে।

এই বিপ্লবের মধ্যমে নিজেকে, নিজেদের বংশধরদেরকে এক খোদার সামনে মাথানত করে রাখা। নামায প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিজেদের সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে কার্যকর করা। এ উদ্দেশ্য সাধনে আমাদেরকে মসজিদগুলো (নামাযী দ্বারা) ভরে ফেলতে হবে যেন মসজিদগুলো আয়তনের দিক থেকে ছোট হয়ে দেখা দেয়।

ক্ষেত্রও প্রশস্ত হবে। তিনি (আ.) এ কথাও বলেছেন যে, "গরিবী হালতে ও ছোট পরিসরে হলেও মসজিদ নির্মান করা জরুরী।" (মালফুযাত, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ৯৩, ২০০৩ রাবওয়াহ সংস্করণ হতে উদ্ধৃত) এ জন্যই হয়তো কারো কারো কাছে মনে হতে পারে, আমরা এতো বড় বড় মসজিদ কেন বানাই? এখন কিছু কিছু জামাতের পক্ষ থেকে মসজিদের আবেদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোন কোন জামাতের কাছে উপকরন পুরোপুরি নেই, কেন্দ্রীয় ভাবে ফান্ড প্রদানের মাধ্যমে তাদের সাহায্য করা হয়। কাজেই মনে হতে পারে, ছোট ছোট মসজিদ বানালে এই টাকায় সেখানে অধিক সংখ্যক মসজিদ নির্মিত হবে।

কিন্তু আমরা যদি একটি মৌলিক নীতিকে দৃষ্টি পটে রাখি তবে হয়তো এ প্রশ্নটি আর উত্থাপিত হবে না। সে নীতিটি হল, 'ইন্নামাল আমালু বিনিয়্যাত' অর্থাৎ সকল কর্মের ভিত্তি নিয়্যতের উপর নিহিত। ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার সবচেয়ে বড় শহর ভেনকোভার। আমার ধারনা এ প্রদেশের এই শহরেই আহমদীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। আর আপনাদের সংখ্যা অনুযায়ী এটি তেমন কোন বড় মসজিদ নয়।

আল্লাহ্ তা'লা নিজ অনুগ্রহে তবলীগের রাস্তা খুলছেন। এরফলে আমাদের প্রশস্থ জমির প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে। আবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর এলহাম, 'ওয়াস্‌সে মাকানাকা,' (তাযকেরা, ২৪৬ পৃষ্ঠা) অর্থাৎ 'তোমার পরিসর বৃদ্বি কর'-এ কারণেও আমাদের জায়গা সম্প্রসারণ প্রয়োজন। ঘর সম্প্রসারণ করা শুধু মাত্র মেহমানদের রাখার জন্য নয়, জনসমাগমের কারণেও ছিল, শুধুই জলসার কারণে নয়, মসজিদের সম্প্রসারণও এই এলহামের জন্য জরুরী। মসজিদের জায়গা বাড়ানোও এই ইলহামের আওতায় পড়ে। আবার দেখুন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কেও এ যুগে আল্লাহ্ ইবরাহীম (আ.) বলে সম্বোধন করেছেন। (বারাহীনে আহমদীয়া, রুহানী খাযায়েন, প্রথম খন্ড, ২৪৬ পৃষ্ঠা) হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মাধ্যমে কা'বা গৃহ নির্মিত হয়েছিল।

আল্লাহ্ তা'লার সর্বপ্রথম গৃহকে তৌহিদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এর মুল ভিত্তির ওপর পুন:নির্মাণ করা হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুসারে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষ তা আবার জানতে পারছে এবং জানতে পারবে। নিশ্চয় এতে কোন সন্দেহ নেই যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর হাতে ইসলামের পুনর্জাগরণ হয়েছে এবং আধ্যাত্মিক অর্থে কা'বা শরীফ নির্মাণের উদ্দেশ্যকে এ যুগে পূর্ণতা দান করা হবে এবং পৃথিবীর মানুষ তা জানতে পারবে।

মসজিদ নির্মানের উদ্দেশ্য হলো, এখানে আল্লাহ্‌র ইবাদতের উদ্দেশ্যে যেন মানুষ একত্রিত হয়। এদিক থেকেও মসজিদ নির্মাণের প্রতি মনোযোগী হওয়া আমাদের জন্য আবশ্যক। আমি যেমন বলেছি, মহানবী (সা.) বলেছেন, আসল বিষয় হলো নিয়্যত, দেখার বিষয় হলো কোন নিয়্যতে কাজটি করা হয়েছে। আমাদের উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করা, তাঁর বাণী পৌঁছানো, বেশী বেশী মানুষকে আল্লাহ্‌র একত্ববাদের পতাকাতলে সমবেত করা। নিজের অবস্থা এবং নিজের বংশধরদের অবস্থার মাঝে বিপ্লব সৃষ্টি করে।

এই বিপ্লবের মধ্যমে নিজেকে, নিজেদের বংশধরদেরকে এক খোদার সামনে মাথানত করে রাখা। নামায প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিজেদের সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে কার্যকর করা। এ উদ্দেশ্য সাধনে আমাদেরকে মসজিদগুলো (নামাযী দ্বারা) ভরে ফেলতে হবে যেন মসজিদগুলো আয়তনের দিক থেকে ছোট হয়ে দেখা দেয়।

অতএব, নিয়্যত যদি এমন হয় তাহলে বাহ্যত মসজিদ অনেক বড় হলেও সেটিকে 'লোক দেখানো'-বলা যায় না। বরং তা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের কারণ হয়। আমি বিশ্বাস করি, আপনারা যারা এখানে বসবাস করেন, আপনারা এই মসজিদকে আবাদ করবেন আপনারা যদি এই নিয়্যতে মসজিদকে আবাদ করার দায়িত্ব পালন করেন, ইসলাম ও আহমদীয়াতের বাণীকে ছড়াতে থাকেন, আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে থাকেন, তবে আপনারা নিজেদের বংশধরদেরকে আল্লাহ্‌র তৌহিদের সাথে সম্পৃক্ত করে নিজেদের ইহকাল ও পরকালকে সুন্দর করে সাজাতে পারবেন, ইনশাআল্লাহ্।

এর ফলে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করে নিজেদের উপর তাঁর পুরস্কারের বৃষ্টি বর্ষণ হতে দেখবেন, ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের বৃষ্টি যখন বর্ষিত আর নিয়্যত যদি তখন কেবলই তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন হয় তাহলে তো একেকাট শহরে একাধিক

মসজিদ নির্মাণের ক্ষমতাও আল্লাহ্ দান করেন।

কাজেই আপনাদের নিয়্যত এই হওয়া উচিৎ যে পরবর্তি মসজিদ বানানোর জন্য চল্লিশ বছর অপেক্ষা করবেন না। বরং এই মসজিদ এবং এরুপ অনেক মসজিদকে আবাদ করে (সেগুলোকে) ধারন ক্ষমতার দিক থেকে ছোট করতে থাকবেন। (আপনারা নিয়্যত করবেন) আমরা মসজিদ আবাদ করে, আল্লাহ তা'লার ইবাদতের অধিকার পালন করে এবং তাঁর নির্দেশানুযায়ী নিজেদের জীবনকে পরিচালিত করে, মসজিদের স্থান সংকুলান না হওয়াকে নিজেদের ওপর আল্লাহ্ তা'লার আশীষকে ব্যাপকভাবে অর্জনের মাধ্যম বানাবো। আল্লাহ্ তা'লার আশীষকে আরো বেশী আকর্ষণ করার মাধ্যম বানাতে থাকবো।

সুতরাং আজ এই সংকল্প নিয়ে আমরা যদি এই মসজিদের উদ্বোধন করি তবে এ পর্যন্ত মসজিদ না বানানোর ক্ষেত্রে আমাদের যে দূর্বলতা হয়েছে তা সংশোধন করার এ এক প্রয়াস হবে। এ দেশের যে সব অঞ্চলে মসজিদ নেই এ মসজিদের উদ্বোধনের সাথে সে সব অঞ্চলে মসজিদ বানানোর দিকে দৃষ্টি দিলে, তাও দূর্বলতা সংশোধন করার এক প্রয়াস হবে। সর্বদা মনে রাখবেন মসজিদের নিজস্ব এক গুরুত্ব আছে। তাই কোন (নামায) সেন্টার বা কোন হল মসজিদের মত গুরুত্ব অর্জন করতে পারে না। নি:সন্দেহে এসব স্থানে জামা'ত একত্রিত হওয়ার সূযোগ পায়। কিন্তু মসজিদের নামের সাথে, আধ্যাত্মিক যে এক সম্পর্ক গড়ে উঠে এবং যে আবেগের সৃষ্টি হয় তা সরাসরি মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে না। এটা মানুষের প্রকৃতি। এখানে জমি কেনা হয়েছে। সেখানে (নামায) সেন্টার বা হলরুম না বানিয়ে সরাসরি মসজিদ বানান। আমি কানাডার এক জামা'ত সম্পর্কে জানতে পেরেছি তাদের কাছে জমি আছে, আর তারা সেখানে হল বানাতে চায়।

আল্লাহ্‌রই প্রতি কৃতজ্ঞতা, পরবর্তিতে আবার যখন তাদের কাছ থেকে পরামর্শ চাওয়া হল তখন তাদের অধিকাংশরাই মসজিদ বানানোর পক্ষে রায় দিয়েছে। যেসব স্থানে মসজিদ বানানোর পরিকল্পনা রয়েছে আল্লাহ তা'লা সেখানে তাদেরকে মসজিদ বানানোর সামর্থ দান করুন।

মসজিদ নির্মিত হলে নিশ্চিতভাবে তবলীগের দ্বার উন্মোচিত হয় এবং তবলীগের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। গত মাসে মার্চের শেষ দিকে ভেলেনসিয়াতে মসজিদের উদ্বোধন করেছিলাম। এখন রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে ওখানে একদিকে অমুসলিমদের মাঝে আমাদের প্রতি এক আকর্ষণ সৃষ্টি হচ্ছে এবং অপরদিকে অআহমদী মুসলমানরা নামায পড়তে আসছে এবং জামা'ত সম্পর্কে তারা অবগত হচ্ছে। ইনশাআল্লাহ্ তাদের মধ্য হতে ভালো প্রকৃতির আত্মাগুলোকে আল্লাহ্ তা'লা আহমদীয়াতে প্রবেশ করার তৌফিক দান করবেন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর ওপর আল্লাহ তা'লা যে সব দায়িত্ব অর্পন করেছেন তার মধ্য হতে একটি হলো মুসলমানদের সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা । এছাড়া তাদেরকে সেই ইসলামের ওপর একত্রিত করা যে ইসলাম মহানবী (সা.) আনয়ন করেছেন এবং তাদের মধ্যে সেই শরীয়ত প্রবর্তন করা যা মহানবী (সা.) এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কে ইলহাম করে বলেছেন "পৃথিবীর সব মুসলমানকে এক ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত কর। " এর ব্যাখ্যায় হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "পৃথিবীর সব মুসলমানকে এক ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত কর, এ এক বিশেষ নির্দেশ।" তিনি (আ.) হযরত ইবরাহীম (আ.) এর উদাহরন দিয়ে বলেন,"আল্লাহ তা'লা যেভাবে ইবরাহীমের জন্য প্রজ্জ্বলিত আগুনকে বলেছিলেন 'কূনি বারদান ওয়া সালামা' অর্থাৎ শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও, তা ঠিক অনুরুপ হয়ে যায়।"

তিনি(আ.) বলেন, "আমার এ ইলহামে যে নির্দেশটি বর্ণিত হয়েছে, এতে মনে হচ্ছে আল্লাহ্ তা'লা চাচ্ছেন পৃথিবীর মুসলমানরা যেন একই জামা'তভুক্ত হয় এবং একত্রিত হয়ে থাকে। হ্যাঁ, এর দ্বারা এ বিষয় বুঝায় না তাদের মধ্যে কোন ধরণের মতভেদ থাকবে না। মতভেদও থাকবে কিন্তু সেটা উল্লেখ করার মতো বা ধর্তব্যের কোন বিষয় হবে না।" (তাযকেরা, ৪৯০ পৃষ্ঠা, ৪র্থ প্রকাশনা, রাবওয়াহ)

তাই আজ মুসলমান-অমুসলমান সবার জন্য হেদায়াতের মাধ্যম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-ই হবেন। এই দেশে আর এই শহরেও হাজার হাজার ও লক্ষ-লক্ষ মুসলমান রয়েছে। নিশ্চিত এই মসজিদ তাদের মনোযোগ আকর্ষণের কারণ হবে। অ-আহমদী ও অ-মুসলিমদের মাঝে এই মসজিদের নেতিবাচক এবং ইতিবাচক উভয় বিষয়ে আলোচনা হবে। আর তাদের এই আলোচনার কারণে আপনাদের তবলীগের রাস্তা আরও প্রসারিত হবে। এই জন্য আপনাদেরকে প্রস্তুতি নিতে হবে। মসজিদ নির্মাণ সম্পন্নের পর একের পর এক দায়িত্ব আপনাদের ওপর বর্তাতে থাকবে। তবলীগের জন্য যখন নিজেদেরকে প্রস্তুত করবেন তখন জ্ঞানের দিক থেকেও প্রস্তুতি নিতে হবে আর আমলের দিক থেকেও সর্বোচ্চ মানদন্ডে পৌঁছানোর চেষ্টা করতে হবে। আর আপনাদের এ বিষয়ে চেষ্টা করা উচিত। নতুবা কথা ও কাজের বৈপরীত্যের কারণে আপনাদের নিকটে কেউ আসবে না। তাই এই মসজিদ নির্মাণের কারণে ব্যক্তিগত পর্যায়ে বরকতের দ্বারসূমহ উন্মোচিত হবে যা এক মু'মিনকে তার ঈমানে বর্ধিত করবে। আর জামাতী বরকত তো আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এভাবে নাযিল হবে যে মানুষ এটা দেখে হতবাক হয়ে যাবে।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় মসজিদের উল্লেখ করেছেন। আর মসজিদের সম্মান প্রতিষ্ঠার বিষয়ও উল্লেখ করেছেন। মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশাবলীও বর্ণনা করা হয়েছে। মসজিদ আবাদকারীদের বৈশিষ্টাবলীর ব্যাপারেও বর্ণনা করা হয়েছে। এখন আমি আপনাদের সামনে যে আয়াত তেলওয়াত করেছি তাতেও মসজিদ আবাদকারীদের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম বিষয় এটি বর্ণনা করা হয়েছে- মসজিদ আবাদকারীরা আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান রাখে। (আর তাদের বলে দাও,) আমরা আল্লাহ্ তা'লার ওপর ঈমান এনেছি-এ কথা বলাই যথেষ্ট নয়। এই ঈমানেরও কয়েকটি ধাপ খোদা তা'লা নির্ধারণ করে রেখেছেন। তিনি বলেন, ঈমানের এই মানদন্ড যদি অর্জন কর তাহলেই তোমরা পূর্ণাঙ্গীন মু'মিন সাব্যস্ত হবে নতুবা তোমাদের ঈমান পূর্ণাঙ্গীন হবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন, 'কালাতিল আ'রাবু আমান্না' অর্থাৎ মরুবাসীগণ বলে আমরা ঈমান এনেছি। অর্থাৎ যারা বাহ্যিক শিক্ষা-দীক্ষা থেকে বঞ্চিত অথবা নিম্ন শ্রেণীর, আর এ কারণে ইসলামের আসল শিক্ষা লাভ করতে পারেনি এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে

মহানবী (সা.) বলেছেন, সে-ই প্রকৃত মু'মিন খোদা তা'লার ভালবাসায় যে বিভোর থাকে।

মহানবী (সা.) একজন মু'মিনের এ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন যে এক নামায থেকে অন্য নামায পর্যন্ত তার মন মসজিদে পড়ে থাকে। সে অপেক্ষার প্রহর গুনতে থাকে যে পরবর্তী নামাযের সময় হলে আমি মসজিদে যাব।

সম্পর্কের বিষয়ে উন্নতি লাভ করে নি তাদের বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা উত্তরে বলছেন, তাদেরকে বলে দাও তোমরা এটা বলো না আমরা ঈমান এনেছি বরং বল 'কুল লাম তু'মিনু ওয়ালাকিন কুলু আসলামনা' (আল হুযূরাত: ১৫) আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)–কে বলেছেন তুমি তাদেরকে বলে দাও তোমরা ঈমান আনো নি বরং তোমরা বল, আমরা বাহ্যিক আনুগত্যকে গ্রহণ করেছি। আর এটা যে কোন কারণেই হতে পারে।

সুতরাং কলেমা পাঠের পর ঈমানে উন্নতি করা, আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা ও তাঁর ইবাদতের প্রতি মনোযোগ দেয়া, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সর্বপ্রকার কুরবানী করতে প্রস্তুত থাকা এবং কুরবানী করা, তাঁর আদেশাবলী পালন করা, এগুলো হচ্ছে মূল বিষয় যা ইসলাম গ্রহণের পর একজন বিশ্বাসীর মধ্যে থাকা প্রয়োজন। যুগ ইমামকে মানার পর একজন আহমদীর মধ্যে এগুলো থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ প্রতিদিন সে আধ্যাত্মিক উন্নতির এক নতুন দৃষ্টান্ত প্রদর্শনকারী হবে যা সে নিজের মধ্যে অনুধাবন করবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ সম্পর্কে বলেছেন,

"তারাই বিশ্বাসী যাদের কর্ম তাদের ঈমানের পক্ষে সাক্ষী দেয়। যাদের হৃদয়ে ঈমান লেখা হয় এবং যে নিজ খোদা ও তাঁর সন্তুষ্টিকে অন্য সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দেয় এবং তাকওয়ার সূক্ষ্ম ও সংকীর্ণ পথসমূহকে খোদা তা'লার (সন্তুষ্টি লাভের) জন্য অবলম্বন করে এবং তাঁর ভালবাসায় বিভোর হয়। ঐসব জিনিষ যা মূর্তির ন্যায় খোদা তা'লার সন্তুষ্টির পথে বাঁধা হয়ে দাড়ায়, তা চারিত্রিক কোন বৈশিষ্ট্য হোক বা অলসতা ও শৈথিল্য, এসব কিছু থেকে সে নিজেকে দূরে নিয়ে যায়।" (মাযমুআত্র ইশতাহারাত, ২য় খন্ড, ৬৫৩-৬৫৪ পৃষ্ঠা, বিজ্ঞাপন নং ২৭০)

অতএব, আমাদেরকে এ মান অর্জন করতে হবে। যখন এ মান অর্জিত হবে, তখনই আমরা আল্লাহ্ তা'লার উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী বলে গন্য হব। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, খোদা তা'লার সন্তুষ্টির জন্য তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথ অবলম্বন করে, 'তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথ'– এর সংজ্ঞায় তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র অধিকারও প্রদান করতে হবে, তাঁর সৃষ্টির অধিকারও প্রদান করতে হবে। নিজ দেহের প্রতিটি অংশ এবং প্রতিটি অঙ্গকে আল্লাহ্ তা'লার আদেশাবলীর অনুগত বানাতে হবে। নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যেমন মন্দকাজ থেকে বাঁচাতে হবে, তেমনি স্বীয় চিন্তা-চেতনাকেও পবিত্র রাখতে হবে। তখন নামাযের সময়ও খোদা তা'লার প্রতি মনোযোগ থাকবে। তখন প্রকৃত অর্থে নামায প্রতিষ্ঠা হবে। যদি দুনিয়া ও দুনিয়ার কামনা-বাসনাই নিজের চিন্তা-চেতনার লক্ষ্যবস্তু হয় তবে নামাযে অটুট মনোযোগ থাকবে না। বাহ্যত মানুষ নামাযরত থাকে কিন্তু মন অন্য দিকে ঘোরাফেরা করতে থাকে। মহানবী (সা.) বলেছেন, সে-ই প্রকৃত মু'মিন খোদা তা'লার ভালবাসায় যে বিভোর থাকে। মহানবী (সা.) একজন মু'মিনের এ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন যে এক নামায থেকে অন্য নামায পর্যন্ত তার মন মসজিদে পড়ে থাকে। সে অপেক্ষার প্রহর গুনতে থাকে যে পরবর্তী নামাযের সময় হলে আমি মসজিদে যাব। (সুনানে নেসাই, কিতাবুত তাহারাত, বাবুল ফাযলে ফি যালেকা, হাদীস নং ১৪৩)

অবশ্য পার্থিব কাজ-কর্মও মানুষের জন্য জরুরী। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদেরকে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে বলেছেন, যে তার ওপর অর্পিত কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করেনা, তাকেও শাস্তি পেতে হবে। (মালফুযাত, ১ম খন্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা হতে সংকলিত, প্রকাশনা-রাবওয়া, ২০০৩) তা ব্যবসা হোক, চাকুরী হোক, কৃষিকাজ হোক, যাই কিছু হোক। কিন্তু এসব কাজের মধ্যেও খোদা তা'লাকে স্মরণ রাখতে হবে। খোদা তা'লাকে স্মরণ রাখলে তার মধ্যে এ মনোভাব থাকবে যে পার্থিব এ কাজও আমি খোদা তা'লার আদেশানুযায়ী করছি। তখন মানুষ বিশ্বস্ততার সাথে সেই কাজ সুচারুভাবে করার চেষ্টা করবে এবং যেকোন ধরনের অন্যায় ও অবৈধ ফায়দা অর্জন থেকেও বাঁচার চেষ্টা করবে।

এরপর একজন মু'মিনের জাগতিক ব্যবসা-বাণিজ্যও ধর্মে পরিণত হয়ে যায়। কেননা একজন মু'মিন প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিকে দৃষ্টিপটে রাখে। সাহাবা (রা.) যাঁরা আমাদের সামনে উন্নত আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তা আমাদের জন্য সাময়িক সৌভাগ্য লাভ করার জন্য ছিল না, প্রশংসা কুড়ানোর জন্য ছিল না। আমাদের পক্ষ থেকে প্রশংসার তাদের কোন প্রয়োজন নেই কেননা স্বয়ং আল্লাহ তা'লাই তাঁদের প্রশংসা

করে দিয়েছেন। তাঁরা আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে এই সনদ পেয়ে গেছেন যে, আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট। অতএব আল্লাহ তা'লা যার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান তার কোন বান্দার প্রশংসার প্রয়োজন থাকে না। হ্যাঁ, এসব আদর্শ আমাদেরকে স্পষ্টভাবে বলছে, তোমরা যদি তাঁদের এসব আদর্শে নিজেদেরকে পরিচালিত কর, আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে যদি জাগতিক ব্যবসা-বাণিজ্য করে যাও তাহলে আল্লাহ তা'লা তোমাদেরকেও তাঁর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত লোকদের অন্তর্ভূক্ত করে নিবেন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, "তোমরা তোমাদের ঈমানের মান উন্নত করতে চাইলে নিজেদের নৈতিক ও চারিত্রিক আদর্শকে উন্নত কর।" (মালফুযাত, ৪র্থ খন্ড, ২১৬ পৃষ্ঠা হতে সংকলিত, প্রকাশনা-রাবওয়া, ২০০৩) বুঝা গেল, শুধু নামায পড়ে নেয়া এবং নিজ ধারনা অনুযায়ী আল্লাহ তালার অধিকার প্রদান করা আল্লাহ তা'লার নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা এবং ঈমানদার বানায় না।

বরং যে ঈমান আনার দাবী করে তার জন্য সমাজের অধিকার প্রদান করাও বাঞ্ছনীয়। তিনি (আ.) বলেন, "অলসতা ও উদাসীনতা পরিহার কর কেননা এটি আল্লাহ তা'লা থেকে দূরে সরিয়ে নেয়।" (মাযমুআত্র ইশতাহারাত, ২য় খন্ড, ৬৫৪ পৃষ্ঠা হতে সংকলিত, ইশতেহার নং ২৭০) যারা পাঁচ বেলার নামায পড়ে না তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে (আমি বিভিন্ন সময় জিজ্ঞেস করে থাকি) তারা এর কারণ অলসতা ও উদাসীনতাই বলেন। পরবর্তীতে এসব অলসতাই আল্লাহ তা'লার ভালবাসা সম্পর্কে উদাসীন করে তোলে আর এমন উদাসীনতা ধীরে-ধীরে ধর্ম থেকেও দূরে সরিয়ে নেয়। পরকালের ভয় এবং আল্লাহ তা'লার সামনে দন্ডায়মান হবার ভয়ও তাদের মাঝে থাকে না। আর এ কারণেই আল্লাহ্ তা'লা মসজিদগুলোতে নামায আদায় করাকে পরকালে ঈমানের চিহ্ন আখ্যা দিয়েছেন। এই জীবনে কৃতকর্মের প্রতিদান পরকালে পাওয়া যাবে।

বিশেষভাবে আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনার্থে কৃত ইবাদতসমূহ এবং এই নশ্বর পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতি ঈমান– তাদেরকে হেদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত করে খোদা তা'লার জান্নাতের ভাগিদার করবে। এরপর তিনি (আ.) বলেন, "আল্লাহ তা'লার মসজিদগুলোকে আবাদ করে তারা একদিকে যেমন সেখানে নিয়মিত নামায আদায় করে, পাঁচ বেলা মসজিদে এসে মসজিদের হক আদায় করে তেমনিভাবে তারা আর্থিক কুরবানীও করে আর এসব আর্থিক কুরবানী আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে করে থাকে।" আল্লাহ্ তা'লার ফজলে আহমদীয়া জামাত মালী কুরবানীর ক্ষেত্রে অসাধারণ কুরবানী করে থাকে। কমপক্ষে এমন একটি শ্রেণী আছেন যারা অসাধারণ কুরবানী করে থাকেন। এই মসজিদের নির্মানের ক্ষেত্রেও এমন অনেক সদস্য আছেন যারা লক্ষ এমনকি কয়েক লক্ষ ডলার আর্থিক কুরবানী করেছেন। মসজিদ নির্মানের জন্য অ-আহমদী মুসলমানরাও অনেক কুরবানী করে কিন্তু আহমদীয়াতের স্বাতন্ত্র হল, তারা স্থায়ী চাঁদাও আদায় করেন, বিভিন্ন তাহরীকেও অংশ নেন। এ দিক থেকে এবং বিশেষভাবে বর্তমান বস্তুবাদী যুগে আর এমন অর্থনৈতিক (মন্দা) অবস্থায় এদের কুরবানী অনেক গুরুত্ব রাখে।

আল্লাহ্ তা'লা ঐ সব কুরবানীকারীদের জান-মালে অঢেল বরকত দান করুন। কিন্তু এটা স্বরণ রাখা প্রয়োজন যে, কেবল একটি কর্মের মাধ্যমে তাকওয়ার মান অর্জন করা যায় না, অথবা ঈমান পরিপূর্ণতা লাভ করে না, বরং প্রত্যেক মু'মিনের জন্য হুকুকুল্লাহ্ এবং হুকুকুল ঈবাদ (খোদার অধিকার এবং বান্দার অধিকার) উভয়ই আদায় করা আবশ্যক। ঈমান আনয়নকারীদের ব্যপারে কুরআন করীমের অন্যান্য স্থানেও উল্লেখ রয়েছে। যার দু'একটি আমি সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করছি। কেননা ঐ বিষয়গুলোর অনুসরণের মাধ্যমেই কেউ নিজেকে প্রকৃত মুমিন বলে দাবী করতে পারে এবং মসজিদের অধিকার আদায়কারী বলে পরিগনিত হতে পারে। "ওয়াল্লাযীনা আমানূ আশাদ্দু হব্বালিল্লাহ" (সূরা বাকারা-১৬৬)। অর্থাৎ যারা মোমেন তারা আল্লাহ্ তা'লাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন যে, "মহাব্বতের (অর্থাৎ ভালবাসার) চরমত্ব হল ইবাদত। তাই মহাব্বত শব্দটি চূড়ান্ত ভাবে খোদা তা'লার সাথে সংশ্লিষ্ট।" (সিরাজ উদ্দীন ঈসাইকে চার সওয়ালোঁ কে জওয়াব, রুহানী খাযায়েন, ২১তম খন্ড, ৩৬৯ পৃষ্ঠা)

এরপর তিনি (আ.) বলেন, "ইবাদাতের দু'টি অংশ। একটি হল, মানুষ যেন খোদা তা'লাকে ভয় পায় অর্থাৎ যতটা ভয় করা উচিৎ। খোদা তা'লার ভয় মানুষকে পবিত্রতার ঝরনার দিকে নিয়ে যায়। আর তার আত্মা বিলীন হয়ে উলুহিয়্যাত (অর্থাৎ খোদার) দিকে বয়ে চলে আর দাসত্বের প্রকৃত অবস্থা তার মাঝে সৃষ্টি হয়ে যায়। প্রথমত: আল্লাহ্ তা'লার ভয়ে হৃদয় বিগলিত হয়। তাঁর সামনে মানুষ সিজদাবনত হয়। তাঁর ইবাদতের অধিকার আদায়ের চেষ্টা করে আর প্রকৃত আরাধনাকারী হবার চেষ্টা করে।" তিনি (আ.) বলেন, "ইবাদতের দ্বিতীয় অংশ হল, মানুষ খোদার সাথে ততটা ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন করবে যতটা করা উচিত আর তাই বলা হয়েছে, "ওয়াল্লাযীনা আমানু আশাদ্দু হব্বালিল্লাহ্" (সূরা বাকারা-১৬৬)।

দুনিয়ার সকল ভালবাসাকে অগ্রাহ্য করে আল্লাহ্ তা'লাকেই যেন প্রকৃত প্রভু জ্ঞান করা হয়। ব্যক্তিগত ভাবে আল্লাহ্ তা'লা এ দুটি অধিকার মানুষের কাছে আশা করেন। এ দুটি অধিকার আদায় করার জন্য এমনিতে সব ধরনের ইবাদাত নিজের মাঝে এক বিশেষ রং রাখে কিন্তু ইসলামে দুটি বিশেষ অবস্থা ইবাদাতের জন্য বরাদ্ধ রয়েছে। ভয় এবং ভালবাসা দুটি এমন বিষয় যা বাহ্যত একত্রিত হওয়া দুষ্কর মনে হয়।

কেননা এক ব্যক্তি যাকে ভয় পায় তাকে কীভাবে ভালবাসতে পারে? কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার ভয় এবং ভালবাসা দুটি ভিন্ন রং। মানুষ খোদার ভয়ে যতটা উন্নতি করবে ততটাই (তাঁর প্রতি) ভালবাসা বাড়তে থাকবে। আর মহাব্বতে ইলাহীতে (খোদা প্রেমে) সে যতটা উন্নতি করবে ততটাই খোদা তা'লার ভয় প্রভাব বিস্তার করে মন্দ বিষয়কে ঘৃনার দৃষ্টিতে দেখে পবিত্রতার দিকে নিয়ে যাবে।" (মালফুযাত, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা: ২২৪-২২৫, প্রকাশনা-রাবওয়া, ২০০৩)

তাই এটি সেই অবস্থা যা প্রত্যেক মুমিনের অর্জন করা আবশ্যক। এ ভালোবাসার ব্যপারে তিনি আরো বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন যে, "ভয়ের জন্য নামায নির্ধারিত আর ভালবাসার বহির্প্রকাশের জন্য হজ্জ নির্ধারিত রয়েছে।" এটি একটি দীর্ঘ বিষয়বস্তু।

মোটকথা, এ অবস্থা প্রত্যেক মুমিনের অর্জন

তাকওয়া ব্যতিত ইবাদতের অধিকার আদায় হতে পারে না। আর আল্লাহ্ তা'লার সমস্ত নির্দেশের ওপর আমল ছাড়া তাকওয়া অর্জিত হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সংশোধনের জন্য কুরআন করীমে অগনিত নির্দেশসমূহ নাযেল করেছেন। যা একজন মু'মিনের পালন করার নির্দেশ রয়েছে আর তখনই সেই হেদায়াতপ্রাপ্ত বলে গণ্য হতে পার।

করা আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লার ভয় তাঁর প্রতি ভালবাসা অর্জনের মাধ্যম হয়। আর যখন এ পর্যায় এবং এ অবস্থা লাভ হয় তখন মানুষ সত্যিকার বান্দা বলে পরিগনিত হতে পারে আর মসজিদের অধিকার আদায়কারী সাব্যস্ত হতে পারে। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) তাঁকে মান্যকারী প্রত্যেকের মাঝে এ অবস্থা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন।

সুতরাং এই মসজিদ নির্মানের সাথে সাথে আমাদের নিজেদের হিসাব নেয়া দরকার, আমরা কতটুকু আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের অধিকার আদায় করেছি। আমরা কতটুকু খোদা তা'লার ভালবাসার দাবী পূর্ণ করছি? আমরা কতটুকু পরস্পরের মধ্যে একে অন্যের অধিকার আদায় করছি? কেননা তাকওয়া ব্যতিত ইবাদতের অধিকার আদায় হতে পারে না। আর আল্লাহ্ তা'লার সমস্ত নির্দেশের ওপর আমল ছাড়া তাকওয়া অর্জিত হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সংশোধনের জন্য কুরআন করীমে অগনিত নির্দেশসমূহ নাযেল করেছেন। যা একজন মুমিনের পালন করার নির্দেশ রয়েছে আর তখনই সেই হেদায়াতপ্রাপ্ত বলে গণ্য হতে পার। দু একটি নির্দেশ উল্লেখ করবো কিন্তু তার আগে এটি স্পষ্ট করছি, আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতে যেটি বলেছেন তা আমি প্রথমে তেলাওয়াত করেছি।

فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

অর্থাৎ অতএব আশা করা যায় ঐ সকল লোক হেদায়াতপ্রাপ্তদের মধ্যে গণ্য হবে। এর অর্থ এটা নয়, এই বিষয়টির ওপর আমল করলেই হয়ত হেদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে। যদি নেক নিয়্যতে করা হয় তাহলেই হয়ত এটি হতে পারে। বরং ভাষাবিদদের নিকট عَسَىٰ যখন খোদা তা'লার জন্য ব্যবহৃত হয় তখন সেটির অর্থ এরূপ হয় যে, আল্লাহ্ তা'লা এমন লোকদেরকে, যারা প্রত্যেক দিক থেকে দৃঢ় ঈমানের অধিকারী, যাকাত, এবং মালি-কুরবাণীতেও আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের মধ্যে গণ্য হয়ে থাকে, আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া জাগতিক কোন জিনিষ তাদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করতে পারে না। অতএব সেটি অবশ্যই আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে হেদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত। আর তাদের মসজিদে আসা, নামায পড়া এবং আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীর ওপর আমল করা তাদেরকে তাকওয়া এবং ঈমানে আরো অগ্রগণ্য করবে এবং তাদের তাকওয়ার মান উন্নত হতে থাকবে।

সুতরাং আমাদের মধ্যে থেকে তারাই সৌভাগ্যশালী যারা আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে হেদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে তাঁর নৈকট্যে উন্নতি করছে। আমি দু' একটি দায়িত্ব সম্পর্কে উল্লেখ করছি যা খোদা তা'লা আমাদের ওপর অর্পন করেছেন অথবা সেই বিষয় যেটি আল্লাহ্ তা'লা আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

তোমরাই সর্বোত্তম উম্মত যাদেরকে মানবজাতির কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দিয়ে থাক এবং অসৎ কাজ থেকে বারণ করে থাক এবং তোমরা আল্লাহ্‌তে ঈমান রেখে থাক। (সূরা আলে ইমরান-১১১)

অতএব এই আয়াতে একজন প্রকৃত মুসলমানের বৈশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে, সে মন্দ কাজ থেকে বাধাদান কারী, নেকীর আদেশ দানকারী। আর এই কাজ মানুষের কথা এবং কাজে এক না হওয়া পর্যন্ত হতে পারে না। যদি আমাদের আমল আমাদের কথা থেকে আলাদা হয় তাহলে আমাদের নিজেদের যে লোকজন রয়েছে তাদের ওপর আমাদের কথায় কোন প্রভাব পড়বে না। আর অন্যদের কথা তো বাদই দিলাম। এই মসজিদ নির্মিত হওয়ার ফলে যেভাবে আমি বলেছি, তবলীগের পথও খুলবে, কিন্তু খোদা তা'লা যেমনটি বলেছেন, যদি আমাদের আমল তেমন না হয়, তাহলে না আমরা খায়রে উম্মত হবো, না আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আমাদের ঈমান থাকবে, না আমাদের নামায কোন কাজে আসবে, আর আমাদের মালি-কুরবাণীও খোদা তা'লার দরবারে গ্রহনীয় হবে না। আর আমাদের এই দাবীও সত্য সাব্যস্ত হবে না, আমরা খোদা তা'লাকে ভয় করি।

কাজেই আমাদের সর্ব প্রথম দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ অনুযায়ী নিজেদেরকে প্রস্তুত করা। আল্লাহ্ তা'লার একটি নির্দেশ হচ্ছে "ওয়া কূলূ লিন্নাসে হুসনা" অর্থাৎ মানুষের সাথে বিনম্র ব্যবহার কর। আমাদের নিজেদের পরস্পরের মাঝে সর্বপ্রথম এটার

বহি:প্রকাশ হওয়া উচিত এবং বিশেষভাবে জামা'তের কর্মকর্তাগনের এ দিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত। তবলীগের আগে তো আমাদের মসজিদসমূহ এমন লোকদের দ্বারা পূর্ণ করা উচিত যারা কেবল খোদার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইবাদতের হক আদায় করেন। অনেক সময় অভিযোগ আসে কতিপয় কর্মকর্তা এরুপ আচরন করেন বা অনেকে আছেন যারা নিজেকে খুব নেক মনে করেন। তারা অন্যদের সাথে এমনভাবে কথা বলেন যা তাদের আবেগ অনুভূতিতে আঘাত হানার কারন হয়। বরং এটি তাঁকে জামাত থেকে দুরে সরানোর কারন হয়।

অতএব এ ধরনের মানুষ মসজিদকে আবাদ করার পরিবর্তে তা বিরান করার কারন বলে সাব্যস্ত হয়। কাজেই খায়রে উম্মতের তো সর্ব প্রথম নিজের সংশোধন করা আবশ্যক। এরপর যেটা সবসময়ই হয়ে আসছে তা হচ্ছে মসজিদের সাথে তবলীগের নতুন পথও উম্মোচিত হয়। এখানেও ইনশাআল্লাহ্ তা'লা উম্মোচিত হবে।

মানুষের মাঝে যারা মসজিদ দেখতে আসবেন তাদের মাঝে, নিজ প্রতিবেশীদের মাঝে এবং নিজ গন্ডির লোকদের মাঝেও এর প্রভাব বিস্তার করুন। যখন লোকেরা আসবে তো সেই সম্পর্ককে আরো পাকাপোক্ত করতে থাকুন।

আহমদীরা যে সকল কাজ অন্যের মঙ্গলার্থে করেন এ বিষয়টি একজন আহমদীর পক্ষ থেকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। ইসলাম এবং কুরআনের শিক্ষা হচ্ছে আমরা নিজেদের লাভের পরিবর্তে অন্যের লাভের কথা চিন্তা করি। মানুষের লাভের কথা কেবল চিন্তাই করি না বরং তা আমাদের কর্মের মাধ্যমেও প্রকাশিত হয়। বিশেষভাবে এখানে এ মসজিদ নির্মানের সাথে সাথে লোকেরা তা লক্ষ্যও করবেন। আল্লাহ্ তা'লা নিজ ফজলের মাধ্যমে তবলীগের পথ উম্মোচিত করছেন। কখনো কখনো এরুপ অদ্ভুত অদ্ভুত সম্পর্কের সৃষ্টি হয় যা বাহ্যত নিজ চেষ্টা প্রচেষ্টা দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়। আপনারা এখানেও দেখবেন এ ধরনের সম্পর্কের সৃষ্টি হবে।

সুতরাং নিজেদের কথা ও কাজ দ্বারা ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন।

আমি যেমনটি বলেছি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আপনাদের পারস্পারিক ভালবাসা ও আন্তরিকতার সম্পর্ক দিন দিন বৃদ্ধি হওয়া উচিত। এ দিকেও বিশেষ দৃষ্টি দিন কেননা তবলীগের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আবার জামা'তের মজবুতির জন্যও জরুরী । আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্যও এ বিষয়টি জরুরী। আল্লাহ্ করুন এ মসজিদ নির্মানের ফলে জামাত যেন অভ্যন্তরীণ ভাবেও দৃঢ়তায় প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশসমূহের প্রতি আমলকারী হোন, মসজিদ আবাদকারী হোন। আপনাদের প্রত্যেকের হৃদয় যেন মসজিদের প্রতি সেভাবে মনযোগী হয় যেভাবে হযরত রাসূল করীম (সা.) একজন মুমিনের প্রতি আশা পোষন করেছেন। এ মসজিদ যেন আল্লাহ্ তা'লার রহমতকে আকর্ষণকারী হয় এবং এটার বহির্প্রকাশ যেন প্রত্যেক আগমনকারীর মঝে পরিলক্ষিত হয়। তবলীগের নতুন নতুন পথও যেন এই মসজিদ নির্মানের ফলে উম্মোচিত হতে থাকে।

মসজিদের কিছু বৃত্তান্ত যা সম্ভবত এখানকার পরিচিতদের জন্য আগ্রহের কারণ নাও হতে পারে তবে বহি র্বিশ্বের জন্য আগ্রহ বহন করে তা উপস্থাপন করছি। এ মসজিদ নির্মাণের ঘোষণা ১৯৯৭ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) দিয়েছিলেন আর নামও রেখেছিলেন 'বায়তুর রহমান'।

এটি প্রায় পৌনে চার একর জমি ব্যাপৃত, এর দ্বিতল আবৃত্ত অংশ হচ্ছে ৩৩ হাজার ৪১৯ বর্গফুট, গম্বুজের উচ্চতা হচ্ছে ৪৭ ফিট, মীনারের উচ্চতা হচ্ছে ৭৬ ফিট, বর্তমানে মসজিদে পুরুষ ও মহিলাদের সম্মিলিত যে দু'টি হল আছে সেই দু'টির বিস্তিতি হচ্ছে ৬,৮০০ বর্গ ফুট আর ১,০৫০ জন নামায পড়ার ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন। বিস্তৃত পার্কিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে, ১২০টি গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা আছে।

মাল্টিপারপাস হলও আছে যাতে ১০৫০ জন নয় বরং ১১৩২ জন নামায পড়তে পারে, উভয় জায়গাসমূহে দুই হাজারেরও বেশি সংখ্যক নামাযী নামায পড়তে পারে। লাইব্রেরীও আছে, একটি তবলীগি সেন্টার আছে, কিচেন আছে, ফিউনারাল হোম সার্ভিসের জন্যও ব্যবস্থা আছে, ৪টি ক্লাস রুম আছে, দফতর সমূহ, বোর্ড রুম, মিশনারীর বাসস্থান, মিশন হাউজ, গ্যাষ্ট হাউজ আছে, এখানে অত্যন্ত সুন্দর ক্যলীগ্রাফির কাজে করা হয়েছে আছে। বিশেষ বিশেষ যে বিষয় সমূহ ছিল আমি সেগুলো বর্ণনা করে দিলাম। কতক অতিরিক্ত ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করে এটির ব্যয় দাড়িয়েছে প্রায় সাড়ে ৮ মিলিয়ন ডলার। যাইহোক আল্লাহ্ তা'লা সব দিক থেকে আপনাদের এ মসজিদকে কল্যাণ মন্ডিত করুন। পরিশেষে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আই.)-এর ছোট একটি উদ্ধৃতি পড়তে চাচ্ছি।

তিনি (আ.) বলেন, "মসজিদের মূল সৌন্দর্য অট্টালিকা সমূহের সাথে নয় বরং সেই নামাযীদের সাথে সম্পর্কযুক্ত যারা নিষ্ঠার সাথে নামায পড়ে নতুবা এ মসজিদসমূহগুলো পরিত্যক্ত। হযরত রাসূল করীম (সা.) এর মসজিদ ছোট ছিল খেজুরের ডাল দিয়ে সেটির ছাদ তৈরী করা হয়েছিল আর বৃষ্টির সময় ছাদ চুয়ে পানি পড়ত।

মসজিদের সৌন্দর্য নামাযীদের সাথে সম্পৃক্ত। মহানবী (সা.) এর সময় দুনিয়াদারেরা একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিল খোদা তা'লার নির্দেশে সেটি ভেঙ্গে দেয়া হয় সেই মসজিদ নাম ছিল "মসজিদে যারার" অর্থাৎ ক্ষতিকারক। সেই মসজিদ মাটিতে ভূপাতিত করে দেওয়া হয়েছিল। মসজিদ সম্পর্কে নির্দেশ হচ্ছে তাক্ওয়া অর্জনের জন্য নির্মাণ করা।" (মালফুযাত, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা: ৪৯১, প্রকাশনা-রাবওয়া, ২০০৩)

সুতরাং প্রত্যেক আহমদীকে এ বিষয়টি সম্মুখে রাখা উচিত। অত:পর তিনি (আ.) বলেন, "জামা'তের নিজস্ব মসজিদ থাকা আবশ্যক যাতে নিজের জামা'তের ঈমাম হবে আর তিনি উপদেশাবলী দিবেন। জামা'তের সদস্যদের সকলে মিলে সেই মসজিদে বাজামত নামায আদায় করা উচিত।

জামা'ত আর ঐক্যে অনেক কল্যাণ রয়েছে। বিভক্তি থেকে অনৈক্য জন্ম নেয়। এ সময় একতা এবং ঐক্যতে অনেক উন্নতি স্বাধন করা উচিত আর ছোট ছোট বিষয় সমূহ যা থেকে অনৈক্য সৃষ্টি হয় সেগুলো ভুলিয়ে দেয়া উচিত।" (মালফুযাত, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা: ৯৩, প্রকাশনা-রাবওয়া, ২০০৩)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে এ অনুযায়ী নিজের জীবন সমূহে পরিবর্তনের তৌফিক দান করুন।

খেদমতে খালক

মওলানা মাহমুদ আহমদ, আমীর, অষ্ট্রেলিয়া

'খেদমতে খালক' এর অর্থ হলো সৃষ্টির সেবা। বিশ্বের অপরাপর সকল ধর্মেই জনসেবার প্রতি তাকিদ করা হয়েছে। জনসেবার জন্য বিশ্বে নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, "সৃষ্টি আল্লাহ্‌র পরিবার ভুক্ত, সৃষ্টির মধ্যে সেই ততোধিক প্রিয় যে পরিবারের অন্যান্যদের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করে।" হযরত মুহাম্মদ (সা.) সমস্ত বিশ্বের জন্য রহমত হয়ে এসেছেন। তিনি বিশ্ব মানবের জন্য শান্তির বাহক। তিনি নির্দিষ্ট কোন দেশ, জাতি বা গোত্রের জন্য প্রেরিত হননি। তাঁর উদার মহান শিক্ষা ও আদর্শ পূর্ব পশ্চিমের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। মহানবীর উপরোক্ত বাণীটি এরই প্রতিপাদক যে, তিনি বিশ্বনবী। বিশ্বের জন্য তিনি রহমত স্বরূপ। এ বাণীটিতে তিনি জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকলের প্রতি এমনকি অপরাপর জীবজন্তুর প্রতি দয়া প্রদর্শনের বিষয়েও ইংগিত করেছেন।

হাদীস গ্রন্থাবলী হতে আমরা জানতে পারি যে, একজন নারী এ কারণে নরকাগ্নিতে প্রবেশ করেছে যে, একটি বিড়ালকে সে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত রেখেছিল। অপরদিকে এক ব্যক্তি পিপাষার্ত একটি কুকুরকে পানি পান করানোর ফলে বেহেশত লাভ করেছে। সৃষ্টির সেবা যে কত মহান কাজ, তা উল্লিখিত দু'টি ঘটনার দ্বারা সহজে অনুমেয়। ধর্ম, মানুষের সুখ-শান্তি ও পথ প্রদর্শন এবং আলোর সন্ধান দিবার জন্য। ধর্মের মৌলিক অংশ দু'টি। প্রথমটি হল আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষের কর্তব্য। নামায, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি। আল্লাহ্‌র গুণ প্রকাশ, মহিমা কীর্তন ও তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা, তা আল্লাহ্‌র নির্দেশিত যে নিয়মেই হউক না কেন, তা মৌখিক ভাবে প্রকাশ, আন্তরিকতার সাথে বিশ্বাস এবং কার্যত: প্রকাশ করলে সাধারণত: আল্লাহ্‌র হক্ আদায় হয়।

দ্বিতীয়টি হল মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য। আল্লাহ্ যা আদেশ দিয়েছেন তা পালনে মানুষ মুক্তি লাভ করতে পারে।

মানুষের প্রতি মানুষের করণীয় যা আছে তা পালনে বান্দার হক আদায় হয়। মানুষ সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করতে ভালবাসে, জীবন ধারণের জন্য একে অপরের প্রতি নির্ভর করে। একা কেহই তার সম্পূর্ণ প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ করতে পারে না। একে অপরের সহায়তা করবে এবং করে থাকে এটাই স্বাভাবিক। কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির কেবল স্তুপীকৃত সম্পদ থাকলেই তার জন্য মহা প্রাসাদ গড়ে উঠবে না। সে জন্য তাকে রাজমিস্ত্রী হতে শুরু করে সাধারণ মজুরের প্রতি নির্ভর করতে হয়। পবিত্র কুরআন মানুষের উন্নতিকল্পে এ মহান দায়িত্বের প্রতি এরূপে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

'ওয়া মিম্মা রাযাকনা হুম ইউন ফিকুন'। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সফলকাম ব্যক্তিদের একটা লক্ষণ এই যে, আমরা তাদেরকে যে রেযেক দিয়েছি তা হতে তারা খরচ করে। রেযেকের অর্থ দান। আল্লাহ্‌র দানের মধ্যে ধন-সম্পদ, বিদ্যা-বুদ্ধি, স্বাস্থ্য, মান সম্মানও রয়েছে। মানুষকে আল্লাহ্ যা দান করেছেন তা হতে সে নিজের পরিবার, প্রতিবেশী, সমাজ ও দেশের হিতার্থে ব্যয় করবে। এস্থলে ***'রেযেক'*** শব্দটি ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার হয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি অন্যকে আর্থিক সাহায্য করতে অসমর্থ হয় তবে তার বিদ্যা থাকলে তদ্বারা অপরের সাহায্য করবে।

বিষয়টি চিন্তা করে দেখলে এর মহত্ব ও যথার্থতা উদ্ঘাটিত হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে। গরীব ছেলেরা লেখাপড়া করতে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হয়। আবার প্রাইভেট শিক্ষকের নিকট পড়ার সামর্থও তাদের হয় না। সম্পদশালীরা তাদের অর্থের দ্বারা এবং শিক্ষিত ব্যক্তিরা তাদের বিদ্যার দ্বারা তাদের সাহায্য করতে পারেন। কারো জ্ঞান থাকলে, কেউ লিখতে পারলে, লেখার মাধ্যমে সে জনসেবার দায়িত্ব পালন করবে। বক্তা তার বক্তৃতার মাধ্যমে, লেখক তার লেখার মাধ্যমে, বিত্তশীল তার সম্পদ দ্বারা, বুদ্ধিমান তার বুদ্ধির দ্বারা, জ্ঞানী তার জ্ঞান দ্বারা, স্বাস্থ্যবান তার শক্তির দ্বারা সমাজের খেদমত করবে। আলোর দিকে পথ দেখাবে। সুপথের দিকে আহ্বান করবে। বিদ্যার দ্বারা জনসেবা করলে বিদ্যা কমে যায় না বরং তার বৃদ্ধি ঘটে, প্রদীপ্ত হয়ে উঠে। আল্লাহ্‌র প্রতিটি দান মানুষের উন্নতির জন্য। প্রয়োজন শুধু পরস্পর সহযোগিতার। গ্রামাঞ্চলে মানুষ একখানা চিঠি পাঠানোর ও লেখানোর জন্য খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হয়। একখানা পত্র পড়ানোর ও লেখানোর জন্যও সমস্যায় পরতে হয় আর এর জন্য কাকুতি মিনতি করতেও দেখা যায়।

পবিত্র কুরআনের যে অংশটি ওপরে পেশ করা হয়েছে এতে মানুষকে স্বার্থপর ও কৃপণ হতে নিষেধ করা হয়েছে। তাই মূল্য ছাড়া কোন কাজেই হাত দেব না বলে যারা প্রতিজ্ঞা করে, তাদের চিন্তা করে দেখা উচিত। সঠিক পথের সন্ধান দেওয়াটাও খেদমতে খালকের অন্তর্গত। অনেক সময় মানুষ পথ ভুলে যায়। বিশেষত: গ্রামের মানুষ শহরে এলে বহুবার পথের লোককে গন্তব্য-স্থল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে।

অনেক সময় পথে ঘাটে কলা বা আমের খোসা ছড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। আবার ঐগুলোতে পা পিছলিয়ে ধরাশায়ী হতে এমনকি হাত পা ভাংগতেও দেখা গেছে। একটু কষ্ট স্বীকার করলে মানুষ পথ-ঘাট পরিষ্কার রেখে এ প্রকারের দুর্ঘটনা হতে রেহাই লাভ করতে পারে। আমরা যাকে ভালবাসি তার দু:খ সহ্য করতে পারি না।

মানুষ যদি বাস্তবিক মানুষকে ভালবেসে থাকে তবে সবার ব্যথায় ব্যথিত হবে ও সবার দু:খে দু:খিত হবে।

যদি কারো শরীরের কোন অংগ আঘাত পায় বা দুর্বল হয়ে পড়ে তবে সে কি আনন্দ পায়? বরং কষ্ট পাওয়াটাই স্বাভাবিক। সমাজের এক অংশ ক্ষুধার্ত, ব্যাধিগ্রস্থ, বস্ত্রহীন হলে অপর অংশ তাদের সাহায্যার্থে প্রাণঢালা সাহায্য করবে। তবেই সুষ্ঠু ও বলিষ্ঠ জাতি গড়ে উঠবে। আত্মতুষ্টির জন্যও খেদমতে খালকের প্রয়োজন রয়েছে। যদি কেহ বোঝা বহন করতে অসমর্থ হয় এবং কুলি-মজুরকে দেবার পয়সাও তার নিকটে না থাকে তবে কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকলে তার বোঝা বহন করা দরকার। বাস, রেলগাড়ী ইত্যাদিতে ভ্রমণের সময় বৃদ্ধলোক বা মেয়েলোকদের বসবার স্থান না পেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। তাদের বসার সংস্থান করে দেওয়াও খেদমতে খালকের অন্তর্গত।

প্রত্যেহ খেদমতে খালকের কত সুযোগ পাওয়া যায়, যেগুলো পালনের জন্য আল্লাহ্ শিক্ষা দিয়েছেন এবং নবীকূল শ্রেষ্ঠ হযরত রাসূল করীম (সা.) স্বয়ং পালন করে গেছেন, কিন্তু আমরা সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করি না বরং অবহেলা করি, অবজ্ঞার চোখে দেখি। স্রষ্টার সৃষ্টিকে অবহেলা করে স্রষ্টাকে তুষ্ট করা চলে না।

মানুষের দুঃখ ও ব্যথায় ব্যথিত হয়ে, তাকে মনে প্রাণে অনুভব করে তার প্রতিকার করার জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা করতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি তার দায়িত্বের প্রতি সজাগ থাকে তবেই খেদমতে খালকের মহান সংঘ গড়ে উঠবে! অপরের প্রতি অনুকম্পা, সহানুভূতি উদারতা ও দয়া প্রদর্শন করা একান্ত প্রয়োজন। দয়া হতে দানশীলতার সৃষ্টি হয়। দানশীলতা ও সেবা করা মানবচরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য, নির্দয় ব্যক্তি পাষানবৎ। অপরের অশ্রু দর্শনে যার হৃদয় বিগলিত হয় না, সে জনসেবার দাবী করতে পারে বটে, কিন্তু কার্যত: কোন উপকারই করতে পারে না। দুঃখির দুঃখমোচন, বিপন্নকে উদ্ধার, শোকাতুরের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা খেদমতে খালকের অন্তর্ভুক্ত। দুঃখমোচন যেমন মানব ধর্ম, ভিক্ষার প্রশ্রয় অথবা অপরের ওপর নির্ভর করে থাকার সুযোগ দেওয়াও সেরূপ অধর্ম। লোক দেখানো দয়া, দান, উপাসনাকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না। কর্তব্যানুসারে জনসেবা করতে হবে প্রকাশ্যে ও গোপনে। তবে এতে বিনয় অবলম্বনই শ্রেয়।

হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, এমনভাবে দান কর যেন, তোমার এক হাত না জানে যে অপর হাত কি দান করেছে।

সকল ধর্মই খেদমতে খালক-এর কাজকে পুণ্য বলেছে। খেদমতের উৎসাহ না থাকলে অন্ধ, খঞ্জ বধিররগণ করাল গ্রাসে নিপতিত হতো। খেদমত করাতে মন উদার হয়। এতে আনন্দ লাভ করা যায়। আর এ খেদমত একমাত্র মানুষের প্রতিই হয় না বরং পশু-পাখি এমনকি বৃক্ষ-লতারও খেদমত করা যায়। অযথা পশু-পাখিকে আঘাত করা, বৃক্ষ-লতাদি ছেড়া, সময়মত ঐগুলোকে বাড়তে না দেওয়া এসব অপকর্ম।

মানুষের এ মহান দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য হযরত রাসূল করীমের (সা.) একটি বাণীই যথেষ্ট। আবু হুরায়রা (রা.) বলছেন যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, কেয়ামত দিবসে আল্লাহ্ বান্দাকে উদ্দেশ্য করে বলবেন, "হে ইবনে আদম! আমি অসুস্থ ছিলাম তুমি আমার সেবা করনি। আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম, তুমি পানি পান করাওনি। বান্দা প্রত্যুত্তরে আবেদন করবে, হে রব! কবে তুমি অসুস্থ ছিলে? আল্লাহ্ বলবেন, অমুক স্থানে আমার এক বান্দা অসুস্থ ছিল, তুমি তার সেবা করনি। যদি তার সেবা-যত্ন করতে তবে তা আমার সেবা করা হতো। অমুক স্থানে আমার এক বান্দা তৃষ্ণার্ত ছিল, তুমি তাকে পানি পান করালেই আমাকে পানি পান করানো হতো।"

আল্লাহ্ তা'লা তো ক্ষুধা, তৃষ্ণা মুক্ত। মানবের প্রতি মানবের যে মহান কর্তব্য ও দায়িত্ব রয়েছে তার প্রতি বিশেষ মনযোগ আকর্ষণের জন্য এত সুন্দর ভাবে উপমাটি দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ্ আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের শক্তি দান করুন, আমীন।

প্রকাশিত হয়েছে

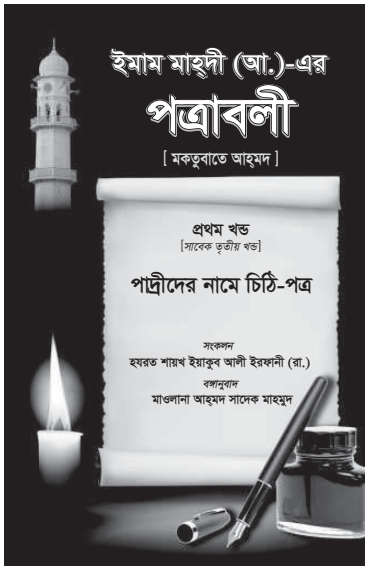

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বিভিন্ন স্তরের লোকদের কাছে যেসব পত্রাবলী প্রেরণ করেছেন তার প্রথম খন্ডের দ্বিতীয় অধ্যায় ও দ্বিতীয় খন্ডের প্রথম অধ্যায় বাংলা অনুবাদ **"ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর পত্রাবলী"** নামে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

বঙ্গানুবাদ করেছেন **মাওলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ**।

বই দু'টির মূল্য যথাক্রমে ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা) এবং ৭৫/- (পচাত্তর টাকা)।

বই দু'টি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।

রূপক বর্ণনার অন্তরালে

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(৫ কিস্তি)

(৪) হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর বংশ, নাম ও দৈহিক গঠন সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর তাৎপর্যঃ

(ক) বংশ, জন্ম ও নাম সম্পর্কে

হাদীসে বংশ, জন্ম ও নাম সম্পর্কে নান প্রকার বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়। কতকগুলি দৃষ্টান্ত নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

✷ *"আল মাহদীয় মিন ইতরাতে মিন আওলাদে ফাতেমা"*

অর্থ:- আমার বংশধর হতে ফাতেমার আওলাদ হতে মাহদীর আগমন হবে" (আবু দাউদ, কনজুল উম্মাল ৬ষ্ঠ খন্ড)।

✷ *"সা-ইয়াথরুজু মিন সালবিহি রাজুলুন ইউসাম্মা বে-ইসমে নাবীয়ুকুম ইয়াশবেহু খুলুকে ওয়ালাফিল খালফে"।*

অর্থ:- "হাসানের আওলাদ হতে মাহদীর আগমন হবে। তিনি তোমাদের নবীর নামে আখ্যায়িত হবেন-জন্ম ও দৈহিক গঠনে তাঁর অনুরূপ হবেন না"। (আবু দাউদ, নাজমুস সাকেব-২য় খন্ড)

✷ *"রাজুলুন মিন আবনায়েল ফারেস"* অর্থাৎ- তিনি পারস্য বংশীয় হবেন। (বোখারী)

✷ তিনি বড় জমিদার বংশীয় হবেন। (আবু দাউদ ২য় খন্ড)

✷ *"মিন আহলে বায়তি ইউরাতিয়ুসমুহু ইলমি"।*

অর্থ:- তিনি আমার বংশ (আহলে বয়েত) হতে হবেন এবং আমার নামে তাঁর নাম হবে"। (আবু দাউদ, তিরমিযি)

✷ তাঁর নামের সঙ্গে 'গোলাম' শব্দটি যুক্ত থাকবে। তাঁর পিতার নাম আলীর নামের অনুরূপ হবে। ('বেহারুল আনোয়ার' নামক শিয়াদের হাদীস সংকলনের বরাতক্রমে)

✷ ইমাম মাহদী (আ.) শুক্রবার জন্মগ্রহণ করবেন বলে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। ('বেহারুল আনোয়ার' ত্রয়োদশ খন্ড পৃ: ১৭৩ বরাতক্রমে)

উল্লেখ্য যে, হাদীসের উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের আলোকে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বংশানুক্রমে তিনি এক দিক দিয়ে ফাতেমী, তথা আহলে বয়েতের অন্তর্ভুক্ত, অন্যদিক দিয়ে পারশ্য বংশীয়। তাঁর পিতৃপুরুষ জমিদার ছিলেন, তাঁর পিতার নাম গোলাম মোর্তজা (যা হযরত আলী (রা.)-এর নামেরই অংশ বিশেষ)। তিনি ১২৫০ হিজরীর ১৪ই শাওয়াল রোজ শুক্রবার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ব্যক্তিগত নাম 'আহমদ' এবং তাঁর নামের সঙ্গে 'গোলাম' শব্দ যুক্ত রয়েছে ইত্যাদি। ফলত: উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ দাবীকারকের বংশ, জন্ম ও নামের যে পরিচিতি প্রদান করেছে সেগুলি কোন মানুষ কর্তৃক কোন ভাবেই যোগ-সাজশ করে সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। এই সকল পরিচিতি এবং চিহ্নাবলীর আলোকে এই দাবীকারককে সনাক্ত করে বহু সত্য-সন্ধানী তাঁর দাবীর সত্যতা মেনে নিয়ে আহমদীয়া জামাতের মাধ্যমে ইসলামের প্রচারাভিযানের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছেন।

(খ) দৈহিক গঠন সম্পর্কেঃ

✷ "আমি স্বপ্নে নিজেকে কাবা তোয়াফ করতে দেখলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আমার সামনে এলো যার বর্ণ গোধুমের (গমের) মত এবং যার মাথায় রয়েছে সরল ও লম্বা কেশ। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: ইনি কে? উত্তর হলো: ইনি মসীহ ইবনে মরিয়ম"। (বোখারী- কিতাবুল ফিতান: যিকরুদাজ্জাল)

উল্লেখ যে, অন্য একটি হাদীসে বনী-ঈসরাইলী নবী হযরত ঈসা (আ.)-এর দৈহিক বর্ণনা সম্বন্ধে হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন: "আমি কাশফে ঈসা এবং মূসাকে দেখেছি। ঈসার গায়ের রং লাল এবং তাঁর কেশ কুঁকড়ানো ও বক্ষ প্রশস্ত ছিল।" (বুখারী, ২য় খন্ড)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বনী-ইসরাইলী নবী ঈসা (আ.) এবং মুহাম্মদী উম্মতে আগমনকারী প্রতিশ্রুত ঈসা (আ.)-এর দৈহিক গঠন ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় তাঁরা দৈহিকভাবে কখনোই একব্যক্তি হতে পারেন না (অবশ্যই আত্মিকভাবে সদৃশ বা অনুরূপ হতে পারেন)। ফলত: উপরোক্ত দু'টি হাদীস দ্বারা একদিকে যেমন একথা সপ্রমাণিত যে, আকাশ হতে লাল বর্ণ ও কুঞ্চিত কেশ-বিশিষ্ট বনী-ইসরাইলী ঈসা (আ.)-এর পূণরাগমন অসম্ভব (কেননা এমতাবস্থায় প্রথমোক্ত হাদীস মোতাবেক লাল বর্ণের পরিবর্তে গোধুম বর্ণ এবং সরল কেশের পরিবর্তে কুঞ্চিত কেশ বিশিষ্ট হয়ে আসতে হবে)। অন্যদিকে মুহাম্মদী উম্মত হতে জন্ম-গ্রহণকারী প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর দৈহিক চিহ্নাবলী-যুক্ত গঠন সম্পর্কেও বর্ণনা করা হয়েছে। বাস্তব ক্ষেত্রে হযরত মির্যা সাহেবের (আ.) দৈহিক গঠন,বর্ণ ও কেশের বর্ণনা প্রথমোক্ত হাদীসের বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলেছে এবং ভবিষ্যদ্বাণীটিকে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ করেছে। তাই হযরত মির্যা সাহেব বলেছেন:"আমিই সেই প্রতিশ্রুত মসীহ। আঁ হযরত (স.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী আমার আকৃতির দিকে লক্ষ্য না করা বড়ই আফসোসের কথা। আমার বর্ণ গন্দমের (গমের রঙের) মত, আমার কেশরাশি ইসরাইলী নবীর কেশ হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন যেভাবে আঁ হযরত (স.) বলেছেন। আমার

হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.)-এর আগমন সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে অধিকাংশ ভবিষ্যদ্বাণী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর জন্ম, বংশ, নাম, শারিরিক গঠন ও অন্যান্য প্রাসংগিক চিহ্নাবলীর বাস্তব সাক্ষ্য দ্বারা পূর্ণ হওয়ায় তাঁর দাবীর সত্যতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

এই আগমন কোন সন্দেহ-স্থল ছিলনা। প্রভু আমাকে লাল বর্ণের মসীহ হতে পৃথক করেছেন।"

✷ "মাহদীর রং আরবীয়দের মত এবং দৈহিক গঠন ইসরাইলীদের মত হবে"। (নাজমুস সাকেব পৃ:৪৯)

✷ "মাহদী আমার প্রিয় ব্যক্তি হবেন। তাঁর ললাট উচ্চ এবং প্রশস্ত হবে। তাঁর নাসিকা উচ্চ হবে"। (আবু দাউদ)

✷ "তাঁর চেহারা নক্ষত্রের মত উজ্জল হবে এবং ডান গালে কাল 'তিল' থাকবে।" (কনজুল উম্মাল)। অন্য একটি ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে যে, তিনি 'তোতলা' হবেন।

উল্লেখ যে, উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে বর্ণিত চিহ্নাবলী হযরত মির্যা সাহেবের (আ.)-এর মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীগণ বলেছেন এবং এগুলির সত্যতা ঐতিহাসিকভাবেও প্রমাণিত হয়েছে।

অর্থ:- "তিনি দুটি হলুদ বর্ণের চাদর পরিহিত হবেন এবং দুজন ফেরেস্তার ডানার উপর নিজ দুটি হাত রাখলেন"। (মুসলিম) উপরোক্ত হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী হযরত মির্যা সাহেবের (আ.) দুটি অসুখ তথা মাথা-ঘোরা এবং ডায়াবেটিস দ্বারা পূর্ণ হয়েছে। উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর ভাষা 'হলুদ চাদর' দ্বারা দুটি অসুখকেই বুঝায়। দ্বিতীয়ত: সংস্কার ও প্রচারমূলক সকল কার্যাবলী ফিরিশ্‌তার সাহায্যের মাধ্যমেই তিনি সম্পাদন করেছেন। কেননা পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে অসম্ভব এবং সর্বপ্রকার প্রতিকুল অবস্থার মুখেও একমাত্র ঐশী সাহায্য ও সমর্থনের (যা ফিরিশ্‌তার মাধ্যমেই তিনি লাভ করেছেন) মাধ্যমে তিনি তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্বাবলী সম্পাদন করতে সক্ষম হয়েছেন।

✷ "ঈসা ইবনে মরিয়ম দুনিয়াতে আবির্ভূত হবেন,বিবাহ করবেন, সন্তান-সন্ততি হবে, ৪৫ বৎসর দুনিয়াতে থাকবেন এবং ওফাত লাভ করবেন। তাঁকে আমার কবরে দাফন করা হবে এবং কিয়ামতের দিন আমি এবং ঈসা ইবনে মরিয়ম একই কবর হতে (আবুবকর ও উমরের মধ্যবর্তী স্থান হতে) উত্থিত হবো"। (কিতাবুল ওয়াফা, মিশকাত)

উল্লেখ্য যে, বিবাহ-শাদী এবং সন্তান লাভের উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী, একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিবাহ এবং সন্তানের জন্ম নিদর্শন-মূলক হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করছে। বাস্তবক্ষেত্রে হযরত মির্যা সাহেবের (আ.) বিবাহ, ঐশী-প্রতিশ্রুত সন্তান হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.)-এর জন্ম এবং সেই সন্তানের মাধ্যমে 'মুসলেহ মাওউদ' সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে (সুদীর্ঘ ৫২ বছর ধরে আহমদীয়া জামা'তের নেতৃত্ব দান করে বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া জামা'তের প্রচার কার্যকে তিনি (রা.) সুসংগঠিত করেন)।

দ্বিতীয়ত: ৪৫বছর দুনিয়াতে থাকার অর্থ এই যে, যথেষ্ট সময় পর্যন্ত তিনি এমনভাবে দুনিয়াতে অবস্থান করবেন যখন চতুর্দিকে প্রচন্ড বিরোধীতা সত্ত্বেও কেউ তাঁর প্রাণ নাশ করতে পারবে না।

তৃতীয়ত: আঁ-হযরত (স.)-এর সঙ্গে একই কবরে দাফনের 'তাবীর' বা রূপক অর্থ এই যে, জীবনে ও মরনে সর্বাবস্থায় প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) ইসলামের শিক্ষা ও ইসলামের নবীর সুন্নতের উপর পুরোপুরি কায়েম থাকবেন। উল্লেখ যে, বাহ্যিক অর্থে একই কবরে দাফন হওয়ার প্রশ্নই উঠেনা। ফলত: অবতীর্ণ হওয়া, বিবাহ করা, দীর্ঘকাল অবস্থান করা, দাফন হওয়া-এই সকল বিষয়ই বিশেষ অর্থে প্রযোজ্য।

(গ) আখেরী জামানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর দৈহিক চিহ্নাবলী এবং আগমন সম্পর্কে বুজুর্গানে উম্মত যে বর্ণনা দিয়েছেন, সেগুলির মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো:-

১- "এই মহাপুরুষ ইমাম মাহদী এক ভগ্নীসহ জন্মগ্রহণ করবেন। তিনি খাতামুল আওলাদ (শ্রেষ্ঠতম সন্তান) ও সুক্ষ্ম তত্বজ্ঞানের অধিকারী হবেন। (হযরত মহিউদ্দিন ইবনে আরাবী (রহ.) প্রণীত 'ফসসুল হিকাম' শীর্ষক পুস্তকের ৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

২- "কতিপয় হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মাহদীর নাম 'আহমদ' হবে। (নবাব সিদ্দিক হাসান খান প্রণীত 'হুজাজুল কেরামা' শীর্ষক পুস্তকের ৩৫৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

৩- হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হযরত শাহ ওলীউল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলবী (রহ.) বলেছেন: "আল্লামানী রাব্বি জাল্লা জালালুহু আন্নাল কিয়ামতে কাদেকতারাবাত ওয়াল মাহদীয়া তাহাই-ইয়া লিল-খুরুজে"। অর্থ: "আমার মহাপ্রতাপশালী রব আমাকে জানিয়েছেন যে, কিয়ামত নিকটবর্তী এবং মাহদী প্রকাশিত হওয়ার প্রস্তুত হচ্ছেন"। (তাফহীমাত্তে ইলাহিয়া, ২য় খন্ড পৃ:১২৩)

৪- প্রসিদ্ধ ওলী হযরত নেয়ামতউল্লাহ (রহ.) লিখেছেন: "তাঁহার নাম আলিফ, হে, মিম, দাল অক্ষর (আর্থাৎ আহমদ) দ্বারা গঠিত হবে"। (মৌলানা মোহাম্মদ ইসমাইল শহীদ প্রনীত 'আবরাইম'-এর বরাতক্রমে)

৫- নবাব সিদ্দিক হাসান খা লিখেছেন:- "যদিও আখেরী জামানার ইমাম মাহদী সম্পর্কিত হাদীসগুলি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়ে যে খ্যাতি লাভ করেছে, তা তাঁর আগমন অস্বীকারকারীদের মত খন্ডন করেছে, তথাপি এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মাহদী সংক্রান্ত হাদীসগুলির অধিকাংশ সনদই বর্ণনাকারীদের অজ্ঞতা, স্মরণশক্তির অভাব, দুর্বলতা ও আপত্তিকর অভিমত দোষে দুষিত। মাহদী সংক্রান্ত দুর্বল ও সন্দেহযুক্ত হাদীসগুলির সমষ্টি শুধু এতটুকুই প্রমাণ করে যে, আখেরী জামানায় ইমাম মাহদী (আ.) আগমন করবেন। ফলত: রেওয়াতগুলি সন্দিগ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এত বহুল যে, এগুলির দ্বারা মাহদী সম্পর্কিত প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র কথা নি:সন্দেহে প্রমাণিত না হলেও মাহদী যে আসবেন, এ কথাটুকু প্রমাণিত হয়"। (হুজাজুল কেরামা ফি আসারিল কেয়ামা, পৃ: ৩৬৫)

৬- প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে খালদুন তাঁর 'মোকদ্দমা' শীর্ষক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) সম্বন্ধে তিরমিযি, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ,হাকেম তিবরাণী এবং আবু ইয়ালা মৌসলীর সকল হাদীস সমূহ উল্লেখ করত: সেগুলির সনদের উপর পর্যালোচনা ও সমালোচনা করেছেন এবং পরিশেষে নিজ মন্তব্য পেশ করতে গিয়ে বলেছেন:

"ইমাম মাহদী (আ.) এবং আখেরী যামানায় তাঁর আবির্ভাব সম্পর্কে ঐ সকল হাদীস যেগুলিকে ইমামগণ মনোনীত করেছেন এবং এই সকল হাদীস যেভাবে আপনারা পর্যালোচনার মাধ্যমে জেনেছেন, সেগুলির স্বল্প সংখ্যক হাদীস ব্যতীত আপত্তি-মুক্ত নয়"।

(ঘ) হযরত ইমাম মাহাদী (আ.) বলেছেনঃ

আলোচ্য বিষয়টি সম্পর্কে ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.) হওয়ার দাবীকারক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) বলেছেন:-

"ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী সম্পর্কে যেসব রেওয়ায়েত রয়েছে, এগুলোর মধ্যে অনেকগুলি অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পরস্পর বিরোধী। এগুলোর অকৃত্রিমতা সম্পর্কে কিছুই জানা নাই এবং সত্য বলে গ্রহণ করার প্রমাণও নাই। এই রেওয়ায়েতগুলির মুল বিষয়বস্তু এই যে, শেষযুগে এক ব্যক্তির আবির্ভাব হবে যিনি মসীহ ও মাহদী হবেন এবং মিমাংসাকারী হবেন। সকল রেওয়ায়েতই এই মূল বিষয়ের সাক্ষ্য বহন করে এবং এ ব্যাপারে কোন বিরোধ নাই। কিন্তু অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণের দিক দিয়ে এতই পরস্পর বিরোধী ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ যে, এগুলির সামঞ্জস্য সাধন করার চেষ্টা করতে গিয়ে অনেক পরীক্ষক, বিদ্বান ও ধর্মবিশারদগণ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁদের কেহ কেহ বলেছেন যে, মাহদী আব্বাস বংশীয় হবেন, কেহ কেহ বলেছেন ফাতেমী বংশীয় এবং হোসেন বংশীয় হবেন বলেও বর্ণনা রয়েছে।

আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, তিনি পবিত্র রাসূল (স.)-এর বংশ হতে আবির্ভূত হবেন এবং এমন মতাবলম্বীও আছেন যারা মনে করেন যে, মাহদী ইসলামের অনুসারীদের মধ্যে একজন সাধারণ সদস্য হবেন। অন্যদিকে আর এক দল এই মত পোষণ করেন যে, মাহদী এবং প্রতিশ্রুত মসীহ এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হবেন এবং তিনি ব্যতীত অন্য কেহ মাহদীরূপে আবির্ভূত হবেন না। এই প্রকারের এবং আরো অনেক বর্ণনা আমাদের কাছে এসেছে। তেমনিভাবে মসীহের আগমনের ব্যাপারেও বহু মতানৈক্য রয়েছে। পবিত্র কুরআন সাক্ষ্য প্রদান করে যে, হযরত ঈসা (আ.) মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও অনেকে বলেন যে, তিনি সশরীরে আকাশে জীবিত আছেন এবং সেখান থেকে আবির্ভূত হবেন। কিছু সংখ্যক বিদ্বান ব্যক্তি রয়েছেন যারা মনে করেন যে, ঈসা (আ.) বাস্তবিকই মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তাঁর দ্বিতীয় আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর তুল্য অপর এক ব্যক্তির আগমনে পূর্ণ হবে। মুত্তাজিলা সম্প্রদায় এবং সুফী সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এরূপ ধারণা পোষণ করে থাকেন" ('নাজমুল হুদা' শীর্ষক পুস্তক দ্রষ্টব্য)।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে আমরা নি:সন্দেহে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.)-এর আগমন সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে অধিকাংশ ভবিষ্যদ্বাণী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর জন্ম, বংশ, নাম, শারিরিক গঠন ও অন্যান্য প্রাসংগিক চিহ্নাবলীর বাস্তব সাক্ষ্য দ্বারা পূর্ণ হওয়ায় তাঁর দাবীর সত্যতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। বাহ্যিক এবং আক্ষরিক অর্থে সবগুলি ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা কখনই বাস্তবে রূপায়িত হতে পারেনা। কেননা, আকাশ হতে চাক্ষুষভাবে দুই ফিরিশ্‌তার কাঁধে ভর দিয়ে দুই হাজার বছর পূর্বের হযরত ঈসা (আ.)-কে স্বশরীরে নেমে আসতে কখনই কেহ দেখবে না (রূপক অর্থে অবশ্যই 'মসীলে ঈসারূপে এই ধরাধামেই তাঁর আবির্ভাব অবধারিত ছিল এবং যথাসময়ে তিনি এসেও গেছেন)। কোন এক ব্যক্তির পক্ষে এতদসম্পর্কিত সংকলিত ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের প্রত্যেকটি কথা আক্ষরিক এবং বাহ্যিকভাবে পূর্ণ করে আবির্ভূত হওয়া কখনই সম্ভবপর নয়। পক্ষান্তরে উপরোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী হযরত মির্যা সাহেব (আ.)-এর মাধ্যমে তাঁর নাম, বংশ, গঠন ইত্যাদি সম্পর্কে অধিকাংশ ভবিষ্যদ্বাণী-যুক্ত লক্ষণ ও চিহ্নাবলী পূর্ণ হওয়ার ঘটনা এমন একটি অলৌকিক বিষয় যা মানবীয় শক্তি এবং সামর্থের বহির্ভূত। ফলত: সার্বিক দৃষ্টিকোণ হতে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, হযরত মির্যা সাহেবের (আ.) দাবীর সমর্থনে যেমন আসমান ও যমীন সাক্ষ্য দিয়েছে, তেমনিভাবে তাঁর বংশ,জন্ম,দৈহিক গঠন সংক্রান্ত সাক্ষ্য সমূহ এবং তাঁর কার্যাবলী তাঁর দাবীর সত্যতাকে সন্দেহাতীত রূপে মোহরাঙ্কিত করেছে।

৫। ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.)-এর আগমনকাল সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর তাৎপর্যঃ

মৌলবী সাহেবরা বলে থাকেন যে, ইমাম মাহদী এবং ঈসা (আ.)-এর আসার সময় হয় নাই। এই প্রসঙ্গে হিজরী চর্তুদশ শতাব্দীতে পবিত্র কুরআন ও হাদীস (সূরা নূর: ৫৬, সাজদাহ: ৬ আয়াত এবং সংশ্লিষ্ট হাদীস) এবং মোজাদ্দিদ সংক্রান্ত হাদীস মোতাবেক সেই মহাপুরুষের আগমন হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী এমন একটি বিষয় যা স্বীকার করতেই হবে। এই প্রসঙ্গে কতকগুলি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজনঃ

১-সূরা নূরের ***'কামা'*** শব্দটির মধ্যে এবং সংশ্লিষ্ট হাদীসের ***খেলাফত-আলা-মিনহাজিন-নবুওয়াত*** অনুযায়ী চর্তুদশ শতাব্দীর প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ আহমদীয়া জামাতের নেতা ব্যতীত আর কেউ আছেন কি? উল্লেখ্য যে হযরত মূসা (আ.) এর ১৩শ বছর পর হযরত ঈসা (আ.) এর আগমন হয়েছিল। তেমনি ভাবে 'কামা' (সদৃশ, অনুরূপ অর্থে) হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের ১৩শত বছর পর 'ঈসা- সদৃশ' তথা মোহাম্মদী মসীহ বা প্রতিশ্রুত ঈসা আগমন করেছেন (যাকে হাদীসে ইমাম মাহদী, খলিফাতুল্লাহ, মুজাদ্দিদ প্রভৃতি উপাধী দ্বারা আখ্যায়িত করা হয়েছে)। সূরা সাজদা: ৬ এবং বুখারী শরিফের হাদীস অনুযায়ী ইসলামের প্রথম তিনশত বছরের উন্নতি ও অগ্রগতির পর এক হাজার বছর ছিল অধ:পতনের যুগ। অর্থাৎ ৩০০+১০০০= ১৩০০ বছর পর ইসলামের পূণর্জাগরণ হওয়া অত্যাবশ্যক ছিল। সূরা জুমুআ: ৪ এবং বুখারী শরিফের হাদীস অনুযায়ী আখেরি জামানায়

হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর দ্বিতীয় আবির্ভাব সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারাও ইসলামের পূণর্জাগরণের শতাব্দি শুরু হওয়া আবশ্যকীয় ছিল। কোন অবস্থাতেই চতুর্দশ হিজরী শতাব্দির প্রারম্ভ থেকে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের সময়কাল বিলম্বিত করার কোন অবকাশ নেই।

২-দাজ্জাল ও দাজ্জালের গাধা সংক্রান্ত ভবিষ্যতবাণীগুলো থেকে বুঝা যায় যে, বর্তমান যুগেই ত্রিত্ববাদী খ্রিষ্টান ধর্ম দাজ্জালের গাধা অর্থাৎ রেলগাড়ী, উড়ো জাহাজ, ষ্টিমার ইত্যাদি যানবাহনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপি এমন ভাবে বিস্তার লাভ করেছে যে, ইতি পূর্বে ইহা সম্ভবপর ছিলনা। যেহেতু এই যুগে এই সকল যানবাহন আবিস্কৃত হয়েছে সেই জন্য এই যুগেই ইমাম মাহদী (আ.)-এর আসা অত্যাবশ্যক ছিল।

৩-ইয়াজুজ ও মাজুজ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ বর্তমান যুগের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কারণ ইয়াজুজ-মাজুজ শব্দ দুটি দ্বারা আরবীতে মূলতঃ আগুনকে বুঝায় এবং আগুন, আগ্নেয়াস্ত্র, বিদ্যুৎ, পরমাণু অস্ত্রের শক্তির ব্যবহার এবং অপ-ব্যবহার এই যুগেই সবচেয়ে বেশী পরিলক্ষিত হচ্ছে। যেমন প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘটনা এবং ভবিষ্যতে তৃতীয় মহাযুদ্ধের আশংকা-এই অবস্থা থেকে বিশ্ববাসীকে উদ্ধার করার জন্য সতর্ককারী হিসেবে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ্ তা'লা তাকে বলেছেনঃ *"দুনিয়ামেঁ এক নজির আয়া"* অর্থাৎ পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী এসেছে। আল্লাহ্ তা'লা কখনোই সতর্ককারী প্রেরণ না করে আযাব দেন না, (সূরা বনী ইসরাইলঃ ১৬)।

৪-হিজরী ১৩১১ সনে চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণী সংক্রান্ত হাদীসটি (দারকুতনী, পৃষ্ঠা ১৮৮) যথা সময়ে পূর্ণ হওয়ার ঘটনা দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, চতুর্দশ হিজরী শতাব্দি অবশ্যই হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের যুগ।

৫-আখেরি যুগের নিদর্শনাবলী এবং লক্ষণ সমূহের পূর্ণতার সাক্ষ্য যা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরায় (আর-রহমান, তাকভীর,) এবং অন্যান্য সূরা ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে সেইগুলি এই যুগের-ই ঘটনাবলী দ্বারা সত্যায়িত হয়েছে। যেমন পানামা এবং সুয়েজ খাল, নতুন নতুন যানবাহন আবিষ্কার, আকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ নিক্ষেপ ইত্যাদি বর্তমান যুগেই হয়েছে।

৬-প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে মুজাদ্দিদ আসার ভবিষ্যদ্বাণী (আবু দাউদ) অনুযায়ী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রতিশ্রুত মুজাদ্দিদ হিসেবে মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ব্যতীত আর কোন দাবীকারক নাই। হিজরী চতুর্দশ শতাব্দির যিনি মুজাদ্দিদ তিনিই প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.)। কারণ হাদীসে আছেঃ "লাল মাহদীয়ু ইল্লা ইসাবনু মারইয়ামা"- অর্থাৎ 'ইসা ইবনে মরিয়ম ব্যতিরেকে অপর কেহ মাহদী নহেন' (ইবনে মাজাহ)। হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর সেই প্রতিশ্রুত মাহদী ও মসীহের আগমনের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন অনেক উলামা। যাদের মধ্যে রয়েছেন-

✷ নবাব সিদ্দিক হাসান খাঁ লিখেছেন-'হিজরী চৌদ্দ শতাব্দী শুরু হওয়ার আর দশ বছর বাকী আছে। যদি এর মাঝে মাহদী ও ঈসা আবির্ভুত হন, তবে তিনিই চৌদ্দ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হবেন' (হুজাজুল কেরামাঃ পৃষ্ঠা ১৩৯, প্রকাশনা ১২৯১ হিজরী)।

✷ 'আহলে হাদীস' পত্রিকা ২৬ জানুয়ারি, ১৯১২ সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় লিখেছে, 'খাজা সাহেব (হাসান নিযামী) লিখেছেন, ইসলামী দুনিয়া ভ্রমনে যত নেতা আলেমগণের সাথে সাক্ষাত হয়েছে, আমি তাদেরকে ইমাম মাহদীর অপেক্ষায় রত পেয়েছি। শেখ সনওয়ারী (রহ.) সাহেবের এক নায়েবের সঙ্গে তার সাক্ষাত হয়েছে, তিনি এতটুকু পর্যন্ত বলেছেন যে, ১৩৩০ হিজরীতে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী আবির্ভুত হয়ে যাবেন।

✷ মেশকাত শরীফের এক হাদীসের সমর্থনে হযরত মোল্লাকারী (রহ.) লিখেছেন যে, বারো শত বছর পর ইমাম মাহদী (আ.) এর প্রকাশিত হওয়ার সময় (মিরকাত, শরহে মিশকাত)

৭-'ইস্তেখারা' দোয়ার মাধ্যমে এবং ঐশী নিদর্শন জনিত 'হাক্কুল একীন' তথা অভিজ্ঞতা-মুলক জ্ঞানের মাধ্যমে শত শত মানুষ সমাগত প্রতিশ্রুত মাহদী ও মসীহ (আ.) এর আগমন সম্পর্কে জানতে পেরে তাঁর দাবীর সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত সুস্পষ্ট নির্দেশের ভিত্তিতে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তাঁর দাবী ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার নামে কেউ কখনোই মিথ্যা বলার দুঃসাহস করতে পারে না (সূরা আল হাক্কাঃ ৪৫-৪৮ এর আলোকে)।

৮- হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেনঃ"কোন কোন হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে, মসীহ মাওউদ ও প্রতিশ্রুত দাজ্জাল উভয়েই প্রাচ্যের কোন দেশ থেকে অর্থাৎ ভারত থেকে আত্মপ্রকাশ করবেন। মসীহ মাওউদ বা তাঁর কোন খলিফা দামেস্কে যাবেন- এটিই *'ইন্না ঈসা ইয়ানযিলু ইনদা মানারাতি দামেস্ক'*, হাদীসের অর্থ। কেননা নাযিল বলা হয় আগন্তুক মুসাফিরকে, যে অন্য দেশ থেকে আসে। এক হাদীসে ব্যবহৃত মাশরেক (প্রাচ্য) শব্দটি এদিকে ইঙ্গিত করে, তিনি প্রাচ্যের কোন দেশ অর্থাৎ ভারত থেকে সফর করে দামেস্ক নগরীর দিকে যাবেন। আমার হৃদয়ে ইলকা (ঐশী চৈতন্যের সঞ্চার) করা হয়েছে,*'ঈসা ইনদা মানারাতে দামেস্ক'* এই শব্দমালা ইঙ্গিত করছে, তাঁর আবির্ভাবের যুগের প্রতি, কেননা হরফগুলোর সংখ্যমানের দিক থেকে (হুরুফে আবজাদের) যোগফল সেই হিজরী সন দাঁড়ায় যে বছর খোদা আমাকে প্রেরণ করেছেন।

৯-ইহুদী জাতির পুনঃএকত্রীকরণ সংক্রান্ত নিদর্শন বর্তমান যুগে পূর্ণতা লাভ করেছে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে সূরা বণী ইস্রায়েলে বলেছেন- "এবং আমরা ইস্রায়েল জাতির নিকট (তাহাদের) ধর্মগ্রন্থে বলিয়াছিলাম যে, তোমরা পৃথিবীতে অবশ্যই দুইবার বিশৃঙ্খলা (ফাসাদ) সৃষ্টি করিবে এবং তোমরা অবশ্যই অতিমাত্রায় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিবে"। (আয়াত-৬)

উপরোক্ত সূরার ১০৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "তাহার (মূসার) পর আমরা ইস্রায়েল জাতিকে বলিয়াছিলামঃ তোমরা যমীনে (কেনানে) বসবাস কর, অতঃপর পরবর্তীকালে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার সময় আসিবে (ওয়াদুল আখেরা), তখন আমরা তোমাদিগকে (বিভিন্ন জাতির মধ্য হইতে) আনয়ন পূর্বক পুনরায় একত্রিত করিব"।

উল্লেখ্য যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ঐতিহাসিক 'বালফোর ঘোষণা' (১৯১৬ খৃঃ) অনুযায়ী বৃটিশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা এবং কুটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইহুদীদের পৃথক আবাসভূমির পরিকল্পনা গৃহীত হয় যা ১৯৪৯ সালে ইস্রায়েল রাষ্ট্র হিসেবে রূপ লাভ করে। এইভাবে পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াত অনুযায়ী ইহুদীদের পুণরায় একত্রিতকরণের ঐশী প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সঙ্গে শেষযুগের প্রতিশ্রুতি (ওয়াদুল আখেরা) সম্বন্ধে উক্ত আয়াতে যে উল্লেখ রয়েছে তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

১০-হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেনঃ "খোদা তা'লা আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন যে, সূরা আসরের অক্ষরের মূল্যায়ন আদম হইতে আঁ হযরত (স.) পর্যন্ত যত বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে তাহার সংখ্যা প্রকাশ করে। উল্লেখিত সূরার প্রেক্ষিতে যখন এই যুগ পর্যন্ত হিসাব করা হয় তখন জানা যাইবে যে, এখন সপ্তম হাজার আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এই

হিসাবের প্রেক্ষিতেই আমার জন্ম ষষ্ঠ হাজারে হইয়াছে" (হাকীকাতুল ওহী)।

১১-। হযরত মহানবী (স.) বলেছেন, "তাঁর নবুওয়াতের পর খেলাফত-আলা মিনহাজিন-নবুওয়াত অর্থাৎ খেলাফতে রাশেদা প্রতিষ্ঠিত হবে, অত:পর অহংকার-মূলক সাম্রাজ্য চলবে, অত:পর যুলুম ও উৎপীড়নের রাজত্ব কায়েম হবে। অত:পর "খেলাফত-আলা মিনহাজিন নবুওয়াত"- অর্থাৎ নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। অত:পর মহানবী (সা.) চুপ থাকলেন" (মেশকাত, আহমদ, বায়হাকী হাদীসের আলোকে)।

মুসলমানদের ইতিহাসে খেলাফতে রাশেদার পর উমাইয়া শাসন, আব্বাসীয় শাসন এবং পরিশেষে তুরস্কে উসমানীয় শাসন (১৫১৭-১৯১৪ খৃ:) বলবৎ ছিল। তুরস্কে নামমাত্র খলিফা সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ-এর সিংহাসন ত্যাগের (১৯০৮ খৃ:) পর থেকে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খেলাফত আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে এবং এখনো প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু আহমদীয়া মুসলিম জামাত ব্যতীত বিশ্বের কোথাও ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.) এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত খলিফা ব্যতীত কোন খেলাফত ব্যবস্থা নাই। কারন, সূরা নূরে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে তিনি স্বয়ং খেলাফত প্রতিষ্ঠা করবেন, কোন গোষ্ঠি বা আন্দোলন দ্বারা খেলাফত প্রতিষ্ঠা লাভের কোন ঐশী প্রতিশ্রুতি নাই। এ বিষয়টি প্রত্যেক বিবেকবান খোদা-প্রেমিককে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

১২- আল্লাহতা'লা প্রত্যেক জাতিতে মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্যই যুগে যুগে কোন না কোন রাসূল প্রেরণ করেছেন (সুরা নহল: ৩৭, ইউনুস: ৪৮ এবং সুরা রাদ: ৮)। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে "আদমের জন্ম হতে কিয়ামত পর্যন্ত দাজ্জালের চেয়ে কোন ভয়াবহ ফেৎনার সৃষ্টি হয় নাই।" (মুসলিম, মেশকাত)। মানব জাতির উদ্ধারকল্পে মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর আর্বিভাবের পূর্বে অতীতে নবীগণ আগমন করেছেন। অতীতের ধর্মীয় গ্রন্থে রূপকের ভাষায় আখেরী যুগে পরিত্রাণকারী হিসাবে বিভিন্ন নামে আগমনকারী প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের আগমনের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ: ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্মের অনুসারীদের জন্য "মনুষ্য-পুত্র মসিহ", হিন্দুধর্মে "কল্কি-অবতার", বৌদ্ধ-ধর্মে "বুদ্ধ-মৈত্তয়" এবং পার্সী ধর্মে "সুসান বা মসিদার বাহরামী" বলে সেই মহা মানবকে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সকল ধর্মের অনুসারীগণ নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের রূপকাবৃত বর্ণনার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও তথ্যাবলী সম্পর্কে নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করলে বর্তমান যুগে সেই সকল ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার বাস্তব প্রমাণ সহজেই প্রত্যক্ষ করতে পারেন।

১৩- পবিত্র কুরআনে সূরা কাহফে ৮৭ নং আয়াতে যুলকারনাইনের উল্লেখ রয়েছে। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন: "এই কুরআনী আয়াতে অনেক গভীর রহস্য অন্তর্নিহিত যা আয়ত্ত করা সাধ্যাতীত। তথাপি খোদা তা'লা আমার কাছে এর যে অর্থ প্রকাশ করেছেন তা হলো: এই আয়াতটি পূর্বাপরের সাথে মিলিত আকারে প্রতিশ্রুত মসিহর বিষয়ে একটি ভবিষ্যদ্বাণী এবং এটি তাঁর আবির্ভাবের যুগ নির্ধারণ করে। এর ব্যাখ্যা হলো, প্রতিশ্রুত মসিহ নিজেও একজন 'যুলকারনাইন'। কেননা, আরবীতে শতাব্দীকে ***'কারণ'*** বলে। কুরআনের আলোচ্য আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে, সেই প্রতিশ্রুত মসিহ যিনি অনাগত একযুগে আবির্ভূত হবেন–তাঁর জন্ম আর তাঁর আবির্ভাব দু'টি শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে সংঘটিত হবে। আর বাস্তবে আমার সত্তা ঠিক এভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। আমার সত্তা সকল প্রচলিত ও পরিচিত শতাব্দী– তা সে হিজরী শতাব্দীই হোক বা খৃষ্টীয় শতাব্দী কিংবা বিক্রমাব্দিই হোক– সর্বক্ষেত্রে আমার দুটি সত্তা বিস্তৃত। কোন একটি শতাব্দীতে আমার জন্ম ও আর্বিভাব সীমাবদ্ধ নয়। তাই, আমার জ্ঞানানুযায়ী, আমার জন্ম ও আবির্ভাব প্রত্যেক ধর্মমতের শতাব্দীতে সম্প্রসারিত। সুতরাং এই অর্থে আমিই 'যূলকারনাইন'। অনুরূপভাবে, কিছু হাদীসেও মসিহ মাওউদের নাম 'যুলকারনাইন' বর্ণিত হয়েছে। এসব হাদীসে সেই অর্থেই 'যুলকারনাইন' ব্যবহৃত হয়েছে যা আমি ব্যক্ত করেছি।" (লেকচার লাহোর)।

১৪- মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ কলহ-কোন্দল ফেতনা-ফ্যাসাদ নৈতিক অধ:পতন, দুর্নীতি এবং দুরাবস্থার বাস্তব চিত্র দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, বর্তমান যুগ-ই প্রতিশ্রুত আখেরী যামানা যখন মহা সংস্কারকরূপে হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। যেভাবে হাদীসে বলা হয়েছে,"মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে যখন ইসলামের মাত্র নাম এবং কুরআনের মাত্র অক্ষরগুলো অবশিষ্ট থাকবে, তাদের মসজিদগুলো বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ হবে, কিন্তু হেদায়েত শুণ্য থাকিবে। তাহাদের আলেমগণ আকাশের নিম্নস্থ সকল সৃষ্টজীবের মধ্যে নিকৃষ্টতম জীব হবে। তাদের মধ্য থেকে ফেতনা-ফ্যাসাদ উঠবে এবং তাদেরই মাঝে তা ফিরে যাবে।" (বায়হাকী, মেশকাত)

আরেকটি হাদীসে আছে," বনী ইসরাইলতো ৭২ ফিরকায় (দলে) বিভক্ত হইয়াছিল, আমার উম্মত ৭৩ ফিরকায় বিভক্ত হইবে। তাহাদের প্রত্যেকেই জাহান্নামে যাইবে কেবল মাত্র এক ফিরকা ব্যতীত। তাঁহারা (সাহাবাগণ) বলিলেন,"হে আল্লাহর রসূল! সেই ফিরকা কোনটি?" তিনি বলিলেন," আমি এবং আমার সাহাবাগণ যে পথে আছে সেই পথে যে ফিরকা থাকিবে"। (তিরমিযি)

মুসলমানগণের বহু দল ও উপদলে বিভক্ত হওয়া এবং একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত অন্যান্য দল দ্বারা নানাভাবে অত্যাচারীত হওয়ার ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইহাই সেই প্রতিশ্রুত যুগ যখন ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের কথা নির্ধারিত ছিল।

বলা বাহুল্য যে, একদিকে ৭২ দলের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব এবং পারস্পরিক ফতোয়াবাজী এবং কোন্দলের আগুনে পতিত হওয়ার সাক্ষ্য এবং অন্যদিকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের খেলাফতভিত্তিক একটি মাত্র দল হওয়ার বাস্তব সাক্ষ্য (আহমদীয়া জামা'ত ব্যতীত বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ইসলামী খেলাফতের অস্তিত্ব নাই।) দ্বারা উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা বর্তমান যুগেই পূর্ণ হয়েছে। বিশেষত: বর্তমানকালে পাকিস্তানে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের উপর চরম অত্যাচার এবং অন্যায়-অবিচারের নির্মম ঘটনাবলী প্রচার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়া দ্বারা সন্দেহাতীত-রূপে বিষয়টি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে ৭২ দলের অবস্থান কিরূপ আর একদল তথা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের অবস্থান কিরূপ এবং উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী কোন্ অবস্থানটি সঠিক এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক সমর্থন-পুষ্ট দল কোনটি। চক্ষু-উম্মীলনকারী এই ঘটনার প্রেক্ষিতে একদিকে আহমদীয়া জামা'তের সত্যতা প্রকাশিত হয়েছে, অন্যদিকে ইতিপূর্বে এরূপ ঘটনার কোন দৃষ্টান্ত না থাকায় বর্তমান যুগেই যে উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীসহ সংশ্লিষ্ট সকল ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে তা সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) যথার্থই বলেছেন: ***"এক নিশা কাফী হ্যায়, গর দিল মে হো খওফে কিরদিগার"*** অর্থাৎ একটি নির্দশনই যথেষ্ট, যদি হৃদয়ে খোদাভীতি থাকে।

(চলবে)

বাইবেলের শিক্ষা বনাম খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস

খন্দকার আজমল হক

বাইবেল খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ। ইহা পুরাতন ও নূতন নিয়ম নামে দু'ভাগে বিভক্ত। ইহুদীগণ পুরাতন নিয়মের ওপর বিশ্বাসী, খ্রিষ্টানগণ পুরাতন ও নূতন উভয় নিয়মের ওপরই বিশ্বাস রাখেন। যীশু খ্রিষ্ট ইহুদী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাই তিনি ইহুদী ছিলেন এবং ইহুদী মতাদর্শ প্রচার করেন। এজন্য তিনি মাঝে মাঝেই পুরাতন নিয়ম হতে উদ্ধৃতি দিতেন। তিনি কখনও তাঁর প্রচলিত ধর্মমতের কোন নাম রাখেন নাই। তাঁর অনুসারীগণ তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর নামানুসারে তাঁর প্রচলিত ধর্মের নাম খ্রিষ্ট ধর্ম এবং নিজেদের খ্রিষ্টান বলে পরিচয় দিতে থাকেন।

বাইবেল খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ হলেও তার শিক্ষার সাথে তাদের বর্তমান প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাসের কোন মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। বাইবেলের (পুরাতন ও নূতন নিয়ম) শিক্ষা ও খ্রিষ্টানদের ভিতর যে বিশ্বাস প্রচলিত আছে তা পর্যালোচনা করলে এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। প্রকৃতপক্ষে যীশু খ্রিষ্টের কোন কোন বাণীর প্রকৃত অর্থ ভুল বোঝার কারণে খ্রিষ্টানগণ তাঁর সম্বন্ধে বাইবেলের বিপরীত শিক্ষা প্রচার করে আসছেন। পাঠক! আসুন, খ্রিষ্টানদের বিশ্বাসসমূহ ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করে দেখি বাইবেলই বা কী বলে এবং খ্রিষ্টানগণই বা কী বিশ্বাস করেন ও প্রচার করে থাকেন।

১। খ্রিষ্টানগণ বলেন "যীশুই ঈশ্বর"। কিন্তু বাইবেল বলে যীশু ঈশ্বরও নন, ঈশ্বরপুত্র নন, ঈশ্বর দ্বারা প্রেরিত মাত্র।

খ্রিষ্টানগণ প্রচার করে থাকেন এবং বিশ্বাস করেন যে যীশুই ঈশ্বর। তাঁরা বলেন, "যদিও তিনি সৃষ্টিকর্তা , তবুও আমাদের প্রতি তাঁর প্রেম তাঁকে মানবাকারে এ জগতে নেমে আসতে বাধ্য করেছে। প্রায় দু'হাজার বৎসর পূর্বে তিনি মাংসে মূর্তিমান হয়ে মনুষ্যবৎ আমাদের সঙ্গে বসবাস করেছিলেন।" (কোন্ ঔষধ প্রচার পত্রিকা)। কিন্তু বাইবেল হতে জানা যায়, যীশু বলেছিলেন, যদিও আমি বিচার করি, আমার বিচার সত্য কেননা আমি একা নই। কিন্তু আমি আছি, আমার পিতা আছেন, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। আর তোমাদের ব্যবস্থাতেই আছে দু'জনের সাক্ষ্য সত্য। আমি আপনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেই আর আমার পিতা তিনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেন।" (যোহন- ৮: ১৬-১৮)

উপরের উদ্ধৃতিতে যীশু পরিষ্কার বলেছেন তিনি ও ঈশ্বর দু'জন। তিনি ঈশ্বর দ্বারা প্রেরীত মাত্র। তিনি নিজেই ঈশ্বর বলে কেন বললেন, "আমি আপনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেই আর আমার পিতা তিনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেন।" তিনি এও বলেছেন, "আমি আছি, আমার পিতা আছেন, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।" যীশু নিজেই ঈশ্বর হলে, "যিনি" কাকে বলেছেন এবং তাকে পাঠালেনই বা কে?

নূতন নিয়মের অনেক স্থানেই যীশু নিজেকে ঈশ্বর দ্বারা প্রেরীত বলেছেন। যেমন বলা হয়েছে "আর যে আমাকে অগ্রাহ্য করে যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।" (লুক-১০:১৬) আরও দেখুন, "আমি আপনা হতে বলি নাই কিন্তু কি কহিব, কি বলিব তাহা আমার পিতা যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তিনিই আমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন" (যোহন-১২:৪) অতএব জানা গেল যে, যীশু ঈশ্বর নহেন, ঈশ্বর দ্বারা প্রেরিত মাত্র। তিনি নিজেই ঈশ্বর হলে কে তাঁকে পাঠালেন?

নূতন নিয়মের বিভিন্ন স্থানে যীশুকে যাঁকে পিতা বলে সম্বোধন করেছেন, তাঁকে যেমন নিজের পিতা বলেছেন. তদ্রুপ তাঁর অনুসারীদেরও পিতা বলেছেন। যেমন এক স্থানে বলা হয়েছে, তুমি আমার ভ্রাতৃগণের নিকট গিয়ে তাদের বল, যিনি আমার পিতা ও তোমাদেরও পিতা এবং আমারও ঈশ্বর তোমাদেরও ঈশ্বর, তাঁর নিকট যাচ্ছি। (যোহন-২০:৩৭) এখানে যেমন ঈশ্বরকে তিনি নিজের পিতা বলেছেন, তদ্রুপ তাঁর অনুসারীদেরও পিতা বলেছেন। অনুরূপভাবে যেমন ঈশ্বরকে নিজের ঈশ্বর বলেছেন, তদ্রুপ তাঁর অনুসারীদেরও ঈশ্বর বলেছেন।

নূতন নিয়মের এক স্থানে যীশু বলেছেন, "হে ইস্রাইল শুন। আমাদের প্রভূ ঈশ্বর একই প্রভূ।" (মার্ক ১২:২৯) এখানে যীশু ঈশ্বরকে "আমাদের প্রভূ" বলায় প্রমাণিত হচ্ছে যে, যীশু কখনও নিজেকে ঈশ্বর বলার শিক্ষা দেন নাই। বরং তিনি তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের প্রভূ সেই সদাপ্রভূকে প্রেম করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন যে এটাই তার সকল প্রজ্ঞার প্রথম আজ্ঞা। (মার্ক- ১২:২৯)

অতএব, বাইবেল হতে জানা গেল যে, যীশু কখনও নিজেকে ঈশ্বর বলেননি। বরং তিনি সদাপ্রভুকেই ঈশ্বর বলেছেন এবং সর্বদা তাঁর নিকটই প্রার্থনা করেছেন, এমনকি তাঁর অনুসারীদেরকেও অনুরূপ করতে বলেছেন। (লুক-১১: ১-২) উল্লেখ্য, যখন তাঁকে

যেখানে যীশু কখনও প্রকৃত ঈশ্বর বা ঈশ্বরপুত্র হবার দাবী করেন নাই, সেখানে তিনি অন্য স্থানে কীভাবে" "আমিই তিনি" বলতে পারেন? যে সকল স্থানে যীশু "আমিই তিনি" বলেছেন, সেখানে উপমাদ্বারা ঈশ্বরের ক্রিয়া নিজের ভিতর প্রতিফলিত বলতে চেয়েছেন।

ক্রুশবিদ্ধ করা হয়। তিনি নিজেকে রক্ষার জন্য ঈশ্বরের নিকটই প্রার্থনা করেছিলেন। বলেছিলেন, "ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করেছ।" (মার্ক-১৫:৩৪)

যীশু অনেক সময় রূপকভাবে কথা বলতেন। তাই তাঁর কথা বুঝতে না পারার কারণে ইহুদীগণ মনে করতেন যে, যিশু ঈশ্বরের দাবী করছেন। অবশ্য যীশু তা নিজেই খন্ডন করতেন। বাইবেলের এক স্থানে বলা হয়েছে, "যিহুদীরা তাঁকে এই উত্তর দিল," উত্তম কার্যের জন্য তোমাকে পাথর মারি না, কিন্তু ঈশ্বর নিন্দার জন্য। কারণ, তুমি মানুষ হয়ে আপনাকে ঈশ্বর করে তুলেছ, এই জন্য।' যীশু তাদেরকে উত্তর করলেন, "তোমাদের ব্যবস্থায় কি লেখা নাই, আমরা বললাম, তোমরা ঈশ্বর।' (গীত- ৮২:৬) যাদের নিকট ঈশ্বরের বাক্য উপস্থিত হয়েছিল, তিনি যদি তাদের মিথ্যা ঈশ্বর বললেন, আর শাস্ত্রের খন্ডনতো হতে পারে না। তবে পিতা যাকে পবিত্র করলেন তোমরা কি তাকে বল যে, তুমি তাকে ঈশ্বর নিন্দা করছ? (যোহন ১০:৩৩-৩৬)

পাঠক! দেখতে পেলেন, যীশু কীভাবে শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে নিজের উপর আরোপিত ঈশ্বরত্বের দাবী খন্ডন করলেন। শাস্ত্রের যে উদ্ধৃতি এখানে দেয়া হয়েছে তা' গীত সংহিতায় আছে। সেখানে ঈশ্বরের বাণী প্রাপ্ত ব্যক্তিদের ঈশ্বর বা ঈশ্বরপুত্র বলা হয়েছে। যীশু উক্ত উদ্ধৃতি দিয়ে ফরিশিদের বলেছিলেন যে শাস্ত্রে ঈশ্বরের বাণী প্রাপ্ত ব্যক্তিদের ঈশ্বর বা ঈশ্বর পুত্র বলায় যদি তারা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর বা ঈশ্বর পুত্র না হন তবে তিনি ঈশ্বর পুত্র বলায় কীভাবে ঈশ্বর নিন্দা করলেন? গীতের অন্য উদ্ধৃতি পর্যালোচনা করলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। গীত বলে, "ঈশ্বর মন্ডলীতে দন্ডায়মান, তিনি ঈশ্বরদের মধ্যে বিচার করেন।"(৮২:১)

আরও দেখুন, "আমিই বলেছি, তোমরা ঈশ্বর তোমরা সকলে পয়াৎ পরের সন্তান। কিন্তু তোমরা মনুষ্যের ন্যায় মরিবে; একজন অধ্যক্ষের ন্যায় পতিত হইবে।" (৮২:৬৭) লুকের ৩:৩৮ আয়াতে আদমকেও ঈশ্বরপুত্র বলা হয়েছে। বাইবেলের নূতন ও পুরাতন নিয়মের অনেক স্থানেই মনুষ্যদেরকেই ঈশ্বর বা ঈশ্বরপুত্র বলা হয়েছে। তাই বলে তারা যেমন ঈশ্বর বা ঈশ্বরপুত্র হন নাই, তেমনি যীশুও নিজেকে ঈশ্বরপুত্র বলায় ঈশ্বর হয়ে যান নাই। আসল কথা, ঈশ্বরের বাণী লাভের কারণে তাদের রূপকভাবে ঈশ্বর বা ঈশ্বরপুত্র বলা হয়েছে। একই কারণে যীশুও নিজেকে ঈশ্বরপুত্র বলেছেন। সত্য সত্যই ঈশ্বর বা ঈশ্বরপুত্র হবার দাবী করেন নাই।

যীশু খ্রিষ্টকে ঈশ্বর বলার স্বপক্ষে আরও একটি যুক্তি দেখান হয়ে থাকে যা যোহন লিখিত সুসমাচার হতে গ্রহণ করা হয়েছে। যোহন বলেন, "ঈশ্বরকে কেহ কখনও দেখে নাই এক "জাতপুত্র" যিনি পিতার ক্রোড়ে থাকেন। তিনিই (তাঁকে) প্রকাশ করেছেন।" (যোহন ১:১৮) উদ্ধৃতিটি একটু ভালভাবে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, এখানে "জাতপুত্র" বলতে শুধু যীশুকেই বুঝান হয় নাই, যাঁরাই ঈশ্বরকে দেখেছেন তাঁদেরকেই ঈশ্বরের জাতপুত্র বলা হয়েছে। কেবলমাত্র যীশুই যদি ঈশ্বরের দর্শন পেতেন, তবে তাকে ঈশ্বরের "জাতপুত্র" বলার অযৌক্তিকতা থাকত। কিন্তু পুরাতন নিয়মের অনেক স্থান হতেই জানা যায় যে, যীশুর পূর্বের ভাববাদীগণও ঈশ্বরের দর্শন লাভ করেছিলেন।

যেমন ঈশ্বর মোশিকে দর্শন দিয়েছিলেন, বাইবেল বলে, "যেন তারা বিশ্বাস করে যে, সদাপ্রভু তাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর, আব্রাহামের ঈশ্বর তোমাদের দর্শন দিয়েছেন।" (যাত্রা- ৪:৫) শুধু মোশিই নয় আব্রাহাম, ইসহাক, য্যাকোবও ঈশ্বরের দর্শন লাভ করেছিলেন, বলা হয়েছে, "ঈশ্বর মোশির সহিত আলাপ করিয়া কহিলেন "আমি যিহোবা (সদাপ্রভু), আমি আব্রাহাম, ইসহাক, য্যাকোবকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বলিয়া দর্শন দিতাম।" (যাত্রা- ৬:২৩) অতএব, যীশুকে 'জাতপুত্র' বলায় যদি তিনি ঈশ্বরের ঔরষজাত পুত্র হন তবে আব্রাহাম, ইসহাক, য্যাকোব, মোশি সকলেই ঈশ্বরের ঔরষজাত পুত্র। কিন্তু খ্রিষ্টানগণ তা স্বীকার করেন না।

উল্লেখ্য, এই 'জাত' শব্দ যে কেবলমাত্র যীশুর জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে, তা নয়। যারা যীশুর প্রকৃত অনুসারী তাদেরকেও "ঈশ্বর হতে 'জাত' বলা হয়েছে। যেমন বাইবেলের এক স্থানে আছে।" তাহারা রক্ত হতে নয়, মাংশের ইচ্ছা হইতেও নয়, এবং মানুষের ইচ্ছা হইতেও নয়, কিন্তু ঈশ্বর হইতে জাত।" (যোহন- ১:৯২-১৩)।

অতএব 'জাত' শব্দ দেখলেই "ঈশ্বর ঔরষজাত" বুঝার কোন যৌক্তিকতা নেই।

একই অর্থে যোহন-৩:১৬-১৮ আয়াত সমূহেও যীশুকে "ঈশ্বর হতে জাত পুত্র বলা হয়েছে। জাত পুত্র বলায় যীশুর আলাদা কোন বৈশিষ্ট্য নেই। কারণ যীশু ঈশ্বরকে যেমন নিজের পিতা বলেছেন, তদ্রুপ তাঁর অনুসারীদেরও পিতা বলেছেন। (যোহন-২০-১৭)। যীশু কেন ঈশ্বরকে পিতা বলেছেন, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। যেমন এক স্থানে বলেছেন। "আর পৃথিবীতে কাউকেও পিতা বলে সম্বোধন করো না, কেননা, তোমাদের পিতা একজন, তিনি সেই স্বর্গীয়।" (মথি- ২৩:৯) এই আয়াত হতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, যেখানেই যীশু ঈশ্বরকে পিতা বলেছেন, সব স্থানেই তাঁকে আধ্যাত্মিক পিতা বলেছেন।

অতএব বাইবেল হতে প্রমাণিত হল যে, খৃষ্টানগণ যে অর্থে যীশুকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরপুত্র বলে মনে করেন, তিনি তা নন। তিনি ঈশ্বর দ্বারা প্রেরীত একজন মানুষ মাত্র। এ জন্য তিনি নিজেকে মনুষ্যপুত্র বলেছেন (যোহন- ৬:৫২-৫৫) কেননা তিনি মনুষ্যসন্তান মরিয়মের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

২। যীশুকে ঈশ্বরের আসনে অধিষ্ঠিত করার কারণ ঃ

পাঠক উপরের অধ্যায়ে দেখতে পেয়েছেন যে, যীশু কখনও নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবী করেননি। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ঈশ্বরপুত্র বললেও কেন বলেছেন তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। বস্তুত যীশুর তত্বকথা না বুঝার কারণেই খ্রিষ্টানগণ তাঁকে ঈশ্বরের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যীশু প্রায়ই উপমা দ্বারা কথা বলতেন।

যেমন তিনি এক স্থানে বলেছেন, "আমি উপমা দ্বারা এ সকল কথা তোমাদেরকে বললাম, এমন সময় আসছে যখন তোমাদেরকে আর উপমা দ্বারা বলব না। কিন্তু স্পষ্টরূপে পিতার বিষয় জানাব।" (যোহন- ১৩:২৫)। নূতন নিয়মে এরূপ উপমার অভাব নেই। যেমন এক স্থানে আছে। "আমি সেই জীবন খাদ্য।" (যোহন- ৬:৩৫) তিনি আরও বলেছেন, "আমি যে খাদ্য দিব, সে আমার মাংস-জগতের জীবনের খাদ্য।" (যোহন- ৫১) যখন ইহুদীরা যীশুর এরূপ কথা না বোঝার কারণে পরস্পর বাকযুদ্ধ করছিল, তখন বললেন, "সত্য সত্য আমি তোমাদেরকে বলছি, তোমরা যদি মনুষ্যপুত্রের মাংস ভোজন ও তার রক্ত পান না কর, তোমাদের জীবন নেই। যে আমার মাংসভোজন ও আমার রক্ত পান করে, সে অনন্ত জীবন পেয়েছে। এবং আমি তাকে শেষ দিন উঠাবো, কারণ আমার মাংস প্রকৃত ভক্ষ্য এবং আমার রক্ত প্রকৃত পানীয়।" (যোহন-৬:৫২-৫৫)। আশা করি খ্রিষ্টানগণ এখানে যীশুর মাংস ও রক্ত বলতে প্রকৃত মাংস ও রক্ত বোঝেন না। এখানে যীশু তাঁর শিক্ষাকে জীবনে পূর্ণরূপে প্রতিফলনের দ্বারা অনন্ত জীবন লাভের উপায় বর্ণনা করেছেন।

বাইবেলের কোন কোন স্থানে যীশু "আমিই তিনি" বলেছেন বলে উল্লেখ আছে। যেখানে যীশু কখনও প্রকৃত ঈশ্বর বা ঈশ্বরপুত্র হবার দাবী করেন নাই, সেখানে তিনি অন্য স্থানে কীভাবে" "আমিই তিনি" বলতে পারেন? যে সকল স্থানে যীশু "আমিই তিনি" বলেছেন, সেখানে উপমাদ্বারা ঈশ্বরের ক্রিয়া নিজের ভিতর প্রতিফলিত বলতে চেয়েছেন। পূর্বের উদ্ধৃতি উপমায় যীশু যেরূপ তাঁর মাংস ভক্ষণ ও রক্তপানের কথা বলে তাঁর শিক্ষাকে জীবনে পূর্ণরূপে প্রতিফলনের নির্দেশ দিয়েছেন, তদ্রুপ তিনি উপমা স্বরূপ "আমিই তিনি" (যোহন- ১:২৪) বলে নিজের ভিতর ঈশ্বরের শিক্ষার পূর্ণ প্রতিফলনের কথা বলেছেন। যীশুর কথা, "আমি ও পিতা আমরা এক" (যোহন- ১০:৩০) "আমিই তিনি" বলার অর্থ পরিষ্কার করে দিয়েছে। নীচের উদ্ধৃতি বিষয়টিকে বুঝতে আরও সাহায্য করবে।

বলা হয়েছে "এখন হতে ঘটবার পূর্বে আমি তোমাদের বলে রাখছি যেন ঘটলে পর তোমরা বিশ্বাস করবে যে, আমিই তিনি। সত্য সত্য আমি তোমাদের বলছি, আমি যে কোন ব্যক্তিকে পাঠাই, তাকে যে গ্রহণ করে সে আমাকেই গ্রহণ করে এবং যে আমাকে গ্রহণ করে সে তাঁকেই গ্রহণ করে যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।" (যোহন- ১৩:১৯-২০) "আমিই তিনি" এর অর্থ যীশু নিজেই ঈশ্বর হলে "যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন" বলতেন না।

এও বলা হয়েছে, "যে তোমাদেরকে মানে সে আমাকেই মানে এবং যে তোমাদেরকে অগ্রাহ্য করে সে আমাকেই অগ্রাহ্য করে। আর যে আমাকে অগ্রাহ্য করে সে তাকেই অগ্রাহ্য করে যিনি আমাকে পাঠিয়েছে।" (লুক- ১০:১৬) আরও দেখুন, "এবং যে আমাকে দর্শন করে সে তাঁকেই দর্শন করে যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন" (যোহন-১২:৪৫)।

উক্ত আয়াত হতে সহজেই প্রতীয়মান হয়, যে অর্থে যীশুর প্রেরীতগণকে গ্রহণ করলে যীশুকে গ্রহণ করা হয়, সেই অর্থে যীশুকে গ্রহণ বা দর্শন করলে ঈশ্বরকেই গ্রহণ বা দর্শন করা হয় বলে বলা হয়েছে।

অতএব, ইহা সহজেই অনুমেয় যে, প্রেরীতদের গ্রহণ করলে যীশুকেই গ্রহণ করা হয় বলায় যেমন প্রেরীতগণ যীশু হন নাই, তদ্রুপ যীশুকে গ্রহণ করলে ঈশ্বরকে গ্রহণ করা হয় বলায় যীশুও ঈশ্বর হন নাই। অর্থাৎ প্রেরীতগণ ও যীশু যেমন দু'টি পৃথক সত্তা, যীশু ও ঈশ্বরও তদ্রুপ দু'টি পৃথক সত্তা।

অতএব "আমিই তিনি" বা "আমি ও পিতা আমরা এক" বলার অর্থ এ নয় যে, যীশু নিজেকে ঈশ্বর বলেছেন।

(চলবে)

প্রকাশিত হয়েছে

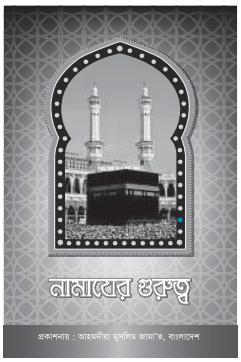

পাঠকের ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে **হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)** প্রদত্ত নামায সংক্রান্ত পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ খুতবা সম্বলিত আকর্ষণীয় বই-

'নামাযের গুরুত্ব' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

বইটির মূল্য ৩০/- (ত্রিশ) টাকা মাত্র।

বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন এবং এর থেকে উপকৃত হোন।

আমাদেরকে সত্য ও সঠিক পথে চালিত কর

সরফরাজ এম এ সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী

পবিত্র কুরআন করীমের সূরা ফাতেহাকে উম্মুল কুরআন অর্থাৎ কুরআন করীমের জননী বলা হয়। এই সূরা জ্ঞানের অফুরন্ত ভান্ডার। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রতি রাকাতে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে করুণা ভিক্ষা প্রার্থনা করা হয় যে, হে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সত্য সরল ও সঠিক পথে চালিত কর, অভিশপ্ত ইহুদী এবং পথভ্রষ্ট খ্রিষ্টানদের পথে চালিত করো না। প্রশ্ন এই যে, কি কারণে ইহুদীগণ অভিশপ্ত হল এবং খ্রিষ্টানগণই বা পথভ্রষ্ট হওয়ার কারণ কি? হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, "আমার উম্মতগণ হুবহু
ইহুদী খ্রিষ্টানদের পথ অনুসরণ করবে" (বুখারী ও মুসলিম)।

হযরত ঈসা (আ.) এর আগমন হয়েছিল ইহুদী জাতির উদ্ধার কল্পে যে কারণে ইহুদীগণ হযরত ঈসা (আ.)কে গ্রহণ করতে পারেন নি বরং তাকে ক্রুশে দিয়ে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল। তার প্রধান কারণ হলো তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী হযরত ঈসা (আ.)-এর পূর্ববর্তী নবী ইলিয়াস (আ.) আকাশে অবস্থান করছেন। আবার তিনি আসমান থেকে পৃথিবীতে নেমে এসে শক্তিবল প্রয়োগে যুদ্ধ বিগ্রহ দ্বারা রক্ত পাত ঘটিয়ে ইহুদীগণকে বিজয় দান করবেন। ইহুদীগণের এই বিশ্বাস এখনও বর্তমান। এইরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণেই ইহুদীগণ হলো অভিশপ্ত। আর খ্রিষ্টানগণ হযরত ঈসা (আ.)কে মান্য করেও পথভ্রষ্টতার কারণ হলো, তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী যীশু ঈসা রক্ত দিয়ে আদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করত: স্বর্গোনীত হয়ে ঈশ্বরের ডান পাশে বসে আছেন, আবার তিনি আসমান থেকে নেমে এসে প্রেম দ্বারা জগত জয় করবেন।

মুসলমান জাতির ওয়ারেসাতুল আম্বিয়াগণের পরস্পর বিরোধী এই যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) সর্বশেষ নবী। তারপরে আর কোন নবী নেই। তিনি মরে গিয়ে মদীনার মাটিতে শুয়ে আছেন। কিন্তু খ্রিষ্টানদের নবী ঈসা (আ.) মরেন নাই। আল্লাহ্ তা'লা তাকে জীবিত স্বশরীরে তাঁর নিকট আসমানে তুলে নিয়েছেন। আবার তিনি আসমান থেকে নেমে এসে ঢাল তলোয়ারের দ্বারা কাফেরদের নিধন করত: রক্তপাত ঘটিয়ে মুসলমান জাতিকে দাজ্জালের কবল থেকে উদ্ধার করবেন। ইহুদী খৃষ্টান ও মুসলমান জাতি বিশ্বাসের দিক দিয়ে একই পথে যাত্রী হয়ে যখন মানবকুল শ্রেষ্ঠ শিরোমনী হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর পবিত্র বাণী যে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এইরূপ ইহুদী খ্রিষ্টান সদৃশজাতিকে উদ্ধারকল্পে ঈসা (আ.) সদৃশ নবীউল্লাহকে ঈসা ইবনে মরিয়ম বলা হয়েছে। কিন্তু এই ঈসা (আ.) খ্রিষ্টানদের নবী সেই ঈসা (আ.) নহেন। মোহাম্মদী ঈসা (আ.), ইমাম মাহ্দী ও ঈসা ইবনে মরিয়ম একই ব্যক্তির দু'টি রূহানী উপাধি। বর্ণিত আছে যে, হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) আক্রমণ করত: ক্রুশ ভঙ্গ করবেন। ক্রুশ বলতে তামা, কাশা, পিতল, লোহা বা কাষ্ঠের নির্মিত ক্রুশ নহে। খ্রীষ্ট ধর্মের ক্রুশীয় মতবাদ খন্ডন করবেন। উল্লেখ আছে যে, "লবণ যেমন পানিতে গলে যায় তদ্রুপ হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) এর নিশ্বাস প্রশ্বাসে কাফেরগণ গলে যাবে"।

প্রশ্ন এই যে, যার নিশ্বাস প্রশ্বাসে কাফেরগণ গলে যাবে, এই অবস্থায় ঢাল তলোয়ারের শক্তির প্রয়োজন কি? মূল কথা ঐশী জ্ঞানের কল্যাণে যুক্তি তর্কে সকলেই তার কাছে পরাজিত হবে।

বাহ্যিক জগতে দেখা যায় যে, প্রত্যেক দলের, প্রত্যেক সংগঠনের, প্রত্যেক বিভাগের একজন প্রধান থাকেন। ইসলাম শান্তি, নিরাপত্তা ও বিশ্বজনীন প্রচারমূলক ধর্ম। ইসলামের অনুসারী মুসলমান জাতির জন্য কোন একজন নেতার প্রয়োজন নাই কি? তাই হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক শতাব্দীর প্রারম্ভে এক একজন মোজাদ্দেদ এই উম্মতের জন্য আবির্ভূত করবেন, যিনি তাদের জন্য ধর্মকে সঞ্জিবিত করবেন (আবু দাউদ, ২য় খন্ড ও মিশকাত)।

যামানার সেই মোজাদ্দেদ বা ইমামকে না মেনে যার মৃত্যু হবে তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের। তিনি যত বড় আলেম-ওলামা, মুফতি, মওলানা, পীর মুর্শিদের দাবীদারই হোন না কেন, জামানার ইমামের হাতে বয়আত না করে মৃত্যু হলে তার মৃত্যু হবে অজ্ঞতার, একথা আলেম ওলামাগণও স্বীকার করেন (দেখুন মওলানা ফজলুল করীম রচিত মানব ধর্ম ৮৪ পৃ:)।

আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সঠিক সময়ে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-কে চৌদ্দশত শতাব্দীর মোজাদ্দেদ ও আখেরী জামানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) রূপে কাদিয়ানে আবির্ভূত করলেন। তিনি এসে ঐশীবাণী প্রাপ্ত হয়ে হযরত ঈসা

(আ.)-এর মৃত্যু সাব্যস্ত করত: কাশ্মিরে তার কবর দেখিয়ে ক্রুশীয় মতবাদকে চুর্ণ বিচুর্ণ করে মাটির ধুলায় মিশিয়ে দিয়েছেন। সাধারণের একটি ভুল ধারণা যে, তিনি শরীয়তবাহী নবী দাবী করেছেন। ইসলামের আলেম ওলামাগণ যেমন নায়েবে রাসূলের দাবীদার তদ্রুপ তিনি সংস্কারক হিসেবে নায়েবে রাসূল। শরীয়তধারী নবীর আগমন চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। "খোদা কোন জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তন নিজেরাই করে" (সূরা রাদ)।

আসল কথা যার জন্য আল্লাহ্ তা'লা আসমান জমীন এবং এতদ্যুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তৎ সমুদয় সৃষ্টি করেছেন, সেই রহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) যখন মৃত্যুবরণ করে মদীনার মাটিতে শুয়ে আছেন, তখন আকাশে পাতালে বা অন্য কোথাও কেই বেঁচে নেই এবং বেঁচে থাকতে পারে না। যদি কারো বেঁচে থাকার প্রয়োজন হতো, তাহলে তিনিই বেঁচে থাকতেন। এ বিশ্বাসই একজন খাঁটি মু'মিন মুসলমান হওয়ার লক্ষণ। আর একাকী থেকে কোন কালেই কেহ আসেন নাই, না আকাশ থেকে না কেহ নেমে আসবেন। যাঁর আসার কথা ছিল, সঠিক সময়ে তিনিই এসে গেছেন। তাঁকে মেনে নেওয়ার মধ্যেই মুসলমান জাতির ভাগ্য পরিবর্তনের আল্লাহ্ তা'লার নির্ধারিত একমাত্র পথ। দ্বিতীয় আর কোন পথ খোলা নাই।

বর্তমান বিশ্বে পঞ্চাশটিরও উর্ধ্বে মুসলিম রাষ্ট্র। বাজামাত নামাযের শিক্ষানুযায়ী তারা যদি আজ একজন ইমাম বা নেতার অধীনে একটি ভ্রাতৃত্ব পরস্পর স্নেহ ও মহব্বতের পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একজন ইমাম বা নেতার আদেশ উপদেশকে মেনে একতাবদ্ধ হয়ে চলতো, তাহলে বিশ্বের বুকে এমন কোন শক্তি ছিল কি যে, এই জাতির গায়ে আঁচর দিতে সাহস করে?

ইদানিং 'মুক্তি সংকট' নামে একটি পুস্তক পাঠ করলাম, লেখক উক্ত পুস্তকে বর্তমান যুগের নায়েবে রাসূলের দাবীদারগণের কার্যকলাপের চিত্র তুলে ধরেছেন। পাক কালামে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "যতদিন অন্যায়ের শেষ চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে এবং যে পর্যন্ত না আল্লাহ্‌র বিধান পূর্ণরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তোমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।" ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, প্রাথমিক যুগের উম্মত মন্ডলী আপন ধন ও জীবন উৎসর্গ করিয়া এই উভয় দায়িত্ব প্রতিপালন করিয়া ছিলেন, যাহার ফলে অতি অল্পদিনের মধ্যে দুনিয়ার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল।

বড়ই দুঃখের বিষয় বর্তমান উম্মতমন্ডলী এই অলৌকিক দায়িত্ব পালনে একেবারেই বিমুখ। ইহার অন্যতম প্রধান কারণ, একালের তথাকথিত নায়েবে রাসূলগণ ইসলামকে অনুষ্ঠান সর্বস্ব ক্রিয়াকান্ডে রূপান্তরিত করিয়া উহা ব্যবসায়ের মূলধনরূপে ব্যবহার করিতেছেন। অথচ আল্লাহ্ দ্বীন প্রতিষ্ঠার বাস্তব পদক্ষেপে তাহারা আদৌ রাজি নহেন। ইহা তাহাদের ভাষায় নাকি 'দুনিয়াদারী'। অথচ প্রকৃত দুনিয়াদারীতে তাহাদিগকে অহর্নিশ মশগুল দেখা যায়।

দ্বীনের প্রতি তাঁহাদের এই নিষ্ক্রিয়তা সমাজের চাবিকাঠি আজ ধর্মদ্রোহী লোকদের হাতে তুলিয়া দিয়াছে, আর তাহাদিগকে করিয়াছে ঐ সকল লোকদের হাতের ক্রীড়ানক। এই সকল ছদ্মবেশী ধর্মব্যবসায়ীদের কবলে পড়িয়া অধিকাংশ সরল প্রকৃতির মুসলমান ধর্মের নামে ভ্রান্ত পথে পদদলিত হইয়া আপনাদের পারলৌকিক মুক্তির পথকে যেভাবে কন্টকাকীর্ণ করিয়া তুলিতেছেন তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া সমাজের কোন কোন সুধী ও বিত্তশীল ব্যক্তি চিন্তিত ও মর্মাহত হইতেছেন। প্রকৃপক্ষে কুরআন হাদীসে সামান্য একটু স্থান লাভ করত: এক শ্রেণীর আলেম যে, আল্লাহ্‌র দ্বীনকে বাজারের পন্যে পরিণত করিয়াছে তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। তাহারা কোথাও বা পীর সাজিয়ে আবার কোথাও ওয়াজ বাজিয়ে সাধারণ মুসলমানদের ভিতরে অবাধে তাহাদের ধর্ম ব্যবসা চালাইয়া যাইতেছে"।

মানবকুল শ্রেষ্ঠ শিরোমনী হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, "মানুষের ওপর এমন এক সময় আসবে, যখন ইসলামের মাত্র নাম এবং কুরআনের মাত্র অক্ষরগুলি, অবশিষ্ট থাকবে। তাদের মসজিদগুলি আড়ম্বরপূর্ণ হবে, কিন্তু হেদায়াত শুন্য থাকবে। তাহাদের আলেমগণ আকাশের নিম্নস্থ সকল সৃষ্টজীবের মধ্যে নিকৃষ্টতম জীব হবে। তাদের মধ্য হতে ফেৎনা-ফ্যাসাদ উঠবে এবং তাদের মধ্যেই উহা ফিরে যাবে।" (বায়হাকী, মিশকাত)

হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর বাণী যে আজ অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়ে গেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পরিশেষে মহান আল্লাহ্ তা'লার দরবারে প্রার্থনা করছি, হে দয়াময় আল্লাহ্ তা'লা! তুমি তাদের হৃদয়ের দোয়ার খুলে দাও যাতে আলো প্রবেশ করে অন্ধত্ব দূরীভূত হয়ে প্রকৃত সত্যকে দেখতে পারে, চিনতে পারে এবং গ্রহণ করতে পারে, আমীন।

৪২তম জাতীয় বার্ষিক ইজতেমায় যোগদান ও দোয়ার আহ্বান

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের ৪২তম জাতীয় বার্ষিক ইজতেমা আগামী ২৭, ২৮ ও ২৯শে সেপ্টেম্বর রোজ শুক্র, শনি ও রাবিবার অনুষ্ঠানের সদয় অনুমোদন দান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ্। আপনারা অবগত আছেন যে, এ বছর খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ ৭৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করছে। এবারের ইজতেমা আকর্ষণীয় ও স্মরণীয় করার জন্য বিভিন্ন দেশের সদর খোদ্দামুল আহমদীয়া-কে আমন্ত্রণ জানানোর প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আশা করি তাদের অংশগ্রহণে এবারের ইজতেমা অনেক বেশী জৌলুষপূর্ণ হবে। সকল খোদ্দাম ও আতফালকে এ মহতী ইজতেমায় যোগদানের আহ্বান জানানো যাচ্ছে।

মনোয়ার হোসেন

নাযেম আলা

৪২তম জাতীয় বার্ষিক ইজতেমা ২০১৩

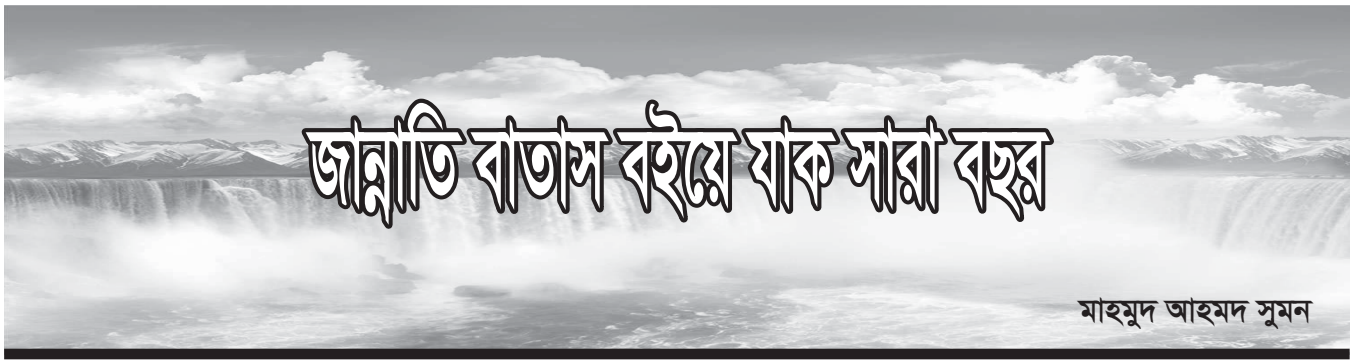

জান্নাতি বাতাস বইয়ে যাক সারা বছর

মাহমুদ আহমদ সুমন

মহান আল্লাহ্ পাকের অশেষ রহমতে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ পবিত্র মাহে রমযানের দিনগুলো বিশেষ ইবাদত বন্দেগীর মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছে, আলহামদুলিল্লাহ। রমযান শুরুর পূর্বে অনেকে চিন্তায় ছিল এতো বড় দিন আর এই গরমে কিভাবে যে রোযাগুলো রাখবো? অথচ যে দিন থেকে রোযা শুরু হলো আর আল্লাহ্ পাক প্রকৃতির মাঝে যেন জান্নাতি বাতাস বইয়ে দিলেন আর প্রতিটি মুসলমান অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দের সাথে রোযার দিনগুলো ইবাদতের মধ্য দিয়ে কাটানোর তৌফিক লাভ করেছে। আমরা কেউ জানি না যে, আগামী রমযান লাভ করার সৌভাগ্য আমাদের কারো হবে কি না। রমযানের এক মাস সিয়াম সাধনার মাধ্যমে আমরা তাক্ওয়া, অন্তরের পরহেজগারী, হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতা এবং খোদা তা'লার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করেছি। চেষ্টা করেছি যাবতীয় গুণাহসমূহ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে আর আল্লাহ্ রাসূলের শিক্ষা মতাবেক জীবন পরিচালিত করতে।

কিন্তু রমযানের রোযার দিনগুলো শেষ হতে না হতেই আমরা দেখতে পাই আমাদের স্বভাব-চরিত্র পূর্বের ন্যায় হয়ে যায়। রোযার দিনগুলোতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায বাজামাত আদায় করার প্রতি যেমন আকর্ষণ ছিল রমযান শেষ হতে না হতেই নামাযের প্রতি কেমন যেন উদাসিন হয়ে যাচ্ছি। পাঁচ ওয়াক্ত নামায ঠিকভাবে আদায় করার প্রতি দেখা দিচ্ছে আলস্য, কথা বলার ক্ষেত্রেও আবার মিথ্যা বলা শুরু করে দিয়েছি, নানান খারাপ কাজে আবার যোগ দিয়েছি। এক কথায় বলা যায় যেই নাকি রমযান শেষ হলো সব ধরণের অপকর্ম আবার শুরু হয়ে যায়। আমরা যদি মনে করি রমযানের রোযাতো রাখলামই এখন আর ধর্ম-কর্ম ঠিকভাবে পালন করে কি করবো আবার আগামী বছর রোযা রেখে খোদার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিব। এমন চিন্তা-ভাবনা যদি কারো মনে জাগ্রত হয় তাহলে সে মারাত্মক ভুল করবে। রোযার দিনগুলো হচ্ছে প্রশিক্ষণের দিন, এই প্রশিক্ষণ মতাবেক বছরের এগার মাস অতিবাহিত করলেই না আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য লাভ সম্ভব হবে। আর না হয় এক মাস রোযা রাখার পর আবার যদি খারাপ কাজে জরিয়ে যাই তাহলে এই রোযা আমাদের জীবনের কোন পরিবর্তন বয়ে আনবে না।

আমাদের রোযা তখনই আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয় হবে যখন আমরা রমযানের পর বাকী এগার মাস রমযান মাসের দিনগুলোর মতই নিজের জীবন অতিবাহিত করব। রমযানে যে বিষয়গুলো প্রশিক্ষণ নিয়েছি তা বাকী দিনগুলোতে কাজে লাগাতে হবে তাহলেই আমাদের রোযা খোদার দরবারে গ্রহণীয়তার মর্যাদা পাবে। রমযান মাসের রোযার পর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখার গুরুত্ব ইসলামে অপরিসীম। শাওয়াল মাসের রোযা সম্পর্কে হাদীসে বিশেষভাবে উল্লেখ রয়েছে। যেমন-হযরত আবু আয়্যুব আনসারী (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখে এবং পরবর্তীতে (ঈদের দিন বাদ দিয়ে) শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযা রাখে সেক্ষেত্রে সে যেন গোটা বছরই রোযা রাখলো (মুসলিম)। এই হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারলাম শাওয়াল মাসের রোযার গুরুত্ব কত ব্যপক।

এখন আমাদের কর্তব্য রমযানের ইবাদতগুলোকে বছর ব্যাপী জারি রাখা। আমরা যদি রমযানের দিনগুলোর ন্যায় সারা বছরই ইবাদত-বন্দেগী ও দান-খয়রাতের প্রতি মনোযোগী হই তাহলে আমরা আল্লাহ্ পাকের প্রিয় ভাজন হতে পারবো। রমযানের দিনগুলোতে যেভাবে আমরা সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি ও দয়ার আচরণ করেছি ঠিক একইভাবে রমযানের পরেও তা বহমান রাখতে হবে। আমরা যদি সারা বছরই রমযানের ন্যায় উত্তম কাজ করতে থাকি তাহলে তা হবে আমাদের নিজেদের জন্যই কল্যাণকর। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন 'যে ব্যক্তি আমলে সালেহ করে তা তার নিজের জন্যই' (সূরা জাসিয়া: ১৬)। এই আমলে সালেহ বা উত্তম কাজ বলতে ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে সমষ্টিগত জীবনে সর্বস্তরের ছোট-বড় সকল প্রকার কল্যাণকর কাজকেই বুঝানো হয়েছে। এখানে সমাজকল্যাণমূলক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক ইত্যাদী সব রকমের কাজই ইসলামের অনুশাসন অনুযায়ী হলে তা-ই আমলে সালেহ বা উত্তম কাজ হিসেবে পরিগণিত হয়। আর এসব কাজের মাধ্যমেই প্রকৃত ঈমানের পরিচয় ও প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই আমরা যদি রমযানের পূর্ণ কর্মগুলোকে নিজেদের জীবনের সঙ্গী বানিয়ে নেই তাহলে আমাদের জীবন হবে শান্তিময় এবং আল্লাহ্ পাক আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন।

সাধারণত দেখা যায়, যারা সারা বছর ইবাদত-বন্দেগিতে যতটা আগ্রহি না তারাও এই রমযান মাসে ইবাদতের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হয়। যারা কোন দিন মসজিদ মুখি হয় না তারাও রমযান মাসে মসজিদে কমপক্ষে দৈনিক একবার হলেও বাজামাত নামায আদায় করেন। এছাড়া এই দিনগুলোতে প্রতিটি মসজিদ মুসল্লিদের দ্বারা থাকে ভরপুর। মসজিদগুলো হয়ে উঠে প্রাণবন্ত। কিন্তু যেদিন থেকেই রমযান শেষ হয় সে দিন থেকেই মসজিদের মুসল্লি কমতে থাকে। যে যুবকরা নিয়মিত মসজিদে এসে নামায আদায় করতো তাদের আর চোখে পরে না, যারা গরীবদের মুখে খাবার ও বস্ত্র তুলে দিত তারাও যেন কোথায় হারিয়ে যায়। এই সব দান-খয়রাত

আর ইবাদত-বন্দেগী কি শুধু রমযান মাসের জন্যই সীমাবদ্ধ? প্রকৃত আল্লাহ্‌র বান্দাতো তারাই যারা সারা বছরই আমলে সালেহ করে এবং আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন থাকে।

আল্লাহ্ পাক এটাই চান যে, তার বান্দারা যেন সব সময় সৎ কাজ করে আর কিভাবে তাদেরকে ক্ষমার চাদরে আবৃত করা যায়। যেমন হাদীসে উল্লেখ আছে, হযরত আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন, মহান আল্লাহ্ বলেন, যে ব্যক্তি একটি সৎ কাজ করবে, সে এর দশ গুণ অথবা অধিক সওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি একটি অন্যায় করবে, সে তেমনি একটি অন্যায়ের শাস্তি পাবে অথবা আমি মাফ করে দিব। যে ব্যক্তি আমার এক বিঘত নিকটবর্তী হবে, আমি তার এক হাত নিকটবর্তী হবো, যে ব্যক্তি আমার এক হাত নিকটবর্তী হবে, আমি তার দুই হাত নিকটবর্তী হবো। যে ব্যক্তি হেঁটে হেঁটে আমার কাছে আসবে আমি দৌড়ে তার কাছে যাবো। যে ব্যক্তি পৃথিবী সমান গুনাহ নিয়ে আমার সাথে সাক্ষাত করবে, অথচ সে আমার সাথে কোন কিছু শরীক করেনি, আমি তার সাথে অনুরূপ পৃথিবীভর্তি ক্ষমা নিয়ে সাক্ষাত করবো (মুসলিম)। তাই রমযানে যেভাবে আমরা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের ভালোবাসা লাভ করার জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা করেছি ঠিক একই প্রেরণা নিয়ে বছরের বাকী দিনগুলোতেও রত থাকতে হবে।

আসলে পবিত্র রমযানের রোযাগুলো প্রকৃত ফলপ্রসু তখনই হবে যখন আমরা সারাটি বছর রমযানের দিনগুলোর ন্যায় কাটাবো। এক মাস রোযা রাখার পর আমার জীবনে যদি আধ্যাত্মিক কোন পরিবর্তনই না ঘটে তাহলে আমি রোযা রেখে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কাছ থেকে কি লাভ করলাম? এছাড়া কেবল মুখে এই দাবি করলেই হবে না যে, এই রমযান থেকে আমি আমার জীবনকে পরিবর্তন করেছি বরং কৃতকর্মেও পরিবর্তনের বিষয়টি প্রকাশ ঘটাতে হবে। আর আমরা যদি এমনটি করি তাহলে আগামী রমযান পর্যন্ত আমাদের দ্বারা যদি ছোটখাট কোন গুনাহ হয়েও যায় তা আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিবেন। যেভাবে হাদীসে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, পাঁচ ওয়াক্তের

প্রকৃত আল্লাহ্‌র বান্দাতো তারাই যারা সারা বছরই আমলে সালেহ করে এবং আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন থাকে।

নামায, এক জুমুআ থেকে আর এক জুমুআ এবং এক রমযান থেকে আর এক রমযানের মধ্যবর্তী দিনগুলোর ছোট ছোট গুনাহের কাফ্‌ফারা হয়, যদি কবীরা গুনাহসমূহ পরিহার করা হয় (মুসলিম)। তাই আমাদের সবাইকে রমযানের আমলে সালেহকে ধরে রাখতে হবে আর কেবল তাহলেই আল্লাহ্ পাক আমাদের ছোট-খাট ভুল-ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দিবেন।

আল্লাহ তা'লার ইবাদতের যে আদেশ তা কি কেবল রমযানের সাথে সংশ্লিষ্ট? রমযান চলে যাবে আর ইবাদতের প্রতি গাফেল হয়ে যাবো, এই শিক্ষা কি ইসলাম দেয়? বরং ইবাদতের আদেশ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'লার স্থায়ী আদেশ যা কেবল রমযানের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। সেই সাথে অসহায়দের সাহায্য করা ও এতিমদের লালন-পালনের প্রতি মনোযোগ দেয়ার যে আদেশ তাও তো স্থায়ী আদেশ এটিও কেবল রমযানের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। আর এ বিষয়ে আমাদের প্রিয় হুযূর (আই.) সম্প্রতি জুমুআর এক খুতবাতেও উল্লেখ করেছেন। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত হবে রমযানের দিনগুলোর ন্যায় সারাটি বছর অতিবাহিত করা।

আমাদের মাঝে তারাই সৌভাগ্যবান যারা রমযানকে একটি প্রশিক্ষণ মাস হিসেবে গ্রহণ করে সারা বছর এর ওপর আমল করে আল্লাহ্ পাকের জান্নাতের অংশীদার হয়। এই যে, এক মাস রোযা রেখেছি এবং নিয়মিত নামায আদায় করেছি এর ফলে অর্থাৎ নামায আর রোযার সমন্বয়ে মানুষের মাঝে কিন্তু খোদার নৈকট্য লাভের এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তা এভাবে যে, নামায আত্মাকে পবিত্র করে এবং রোযা হৃদয়কে আলোকিত করে। ফলশ্রুতিতে নিষ্ঠাবান ব্যক্তি রোযা দ্বারা আধ্যাত্মিকতার এক নতুন রাস্তায় পরিচালিত হয়ে খোদার সন্তুষ্টির ছায়াতলে চলে আসে।

পবিত্র কুরআন বলে, রোযা তোমাদের মাঝে তাক্‌ওয়া অর্থাৎ খোদা-ভীতি সৃষ্টি করবে। এই তাক্‌ওয়া কিভাবে সৃষ্টি হবে? বস্তুতঃ রোযা এমন ইবাদত যা মানুষের প্রতিটি ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করে। যদি ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ না রেখে কেউ রোযা রাখে তবে তা রোযা নয় বরং অন্য কিছু। খোদা-ভীতির সৃষ্টি এভাবেই হয় যে, মানুষ খোদার সন্তুষ্টির জন্য নিজের মন-মেজাজ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে খোদার ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেয়। ফলে ধীরে ধীরে তার অবাধ্য আত্মা নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে। ঐ সকল কর্ম হতে সে দূরে সরে পরে যা খোদার অসন্তুষ্টির কারণ হয়।

আমাদের সবার উচিত, রমযানের দিনগুলো যেভাবে ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে কাটিয়েছি বছরের বাকী দিনগুলোও যেন সেভাবেই কাটাই। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে শাওয়াল মাসের ৬টি রোযা রাখার তৌফিক দান করুন আর সেই সাথে বছরের অন্যান্য মাসেও যেন হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর সুন্নত অনুযায়ী দু'তিনটি করে নফল রোযা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলি। এছাড়া আমাদের যুগ খলিফার পক্ষ থেকেতো এই তাহরীক রয়েছে যে, প্রত্যেক আহমদী যেন প্রতি সপ্তাহে একটি করে নফল রোযা রাখে তাই এদিকেও আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে। আমরা যদি প্রতি সপ্তাহে নফল রোযাগুলো রাখতে থাকি তাহলে মহান আল্লাহ্ তা'লার সাথে আমাদের সম্পর্ক হবে সুদৃঢ়। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কাছে এই প্রার্থনাই করি, প্রবিত্র রমযানের জান্নাতি বাতাসে প্রতিটি মু'মিনের আত্মা হোক উজ্জিবিত আর এই বাতাস বইয়ে যাক সারা বছর, আমীন।

masumon83@yahoo.com

উম্মী নবী (সা.)-এর গোলাম উম্মতী নবী (আ.)

ডা: শেখ হেলাল উদ্দীন আহমদ

এবারকার বিষয়টি নি:সন্দেহে একটি স্পর্শ কাতর বিষয় বটে, তবে আহমদীদের জন্য স্পর্শকাতর তো নয়ই, বরং খুবই মর্যাদাপূর্ণ এবং হৃদয়ে গ্রহণযোগ্যতার বিষয়। কেননা, উম্মী নবী রাসূলে আজম হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তাঁরই মহান ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে আমরা আগমনকারী উম্মতী নবী মুজাদ্দিদে আজম হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে জেনে বুঝে গ্রহণ করেছি।

উল্লেখ্য যে, নবী উম্মী হোক, উম্মতী হোক কোন ধরনের নবীই মানুষের দ্বারা মনোনীত হয় না, এটি একমাত্র মহান আল্লাহ্ পাকের কাজ। আল্লাহ্ পাকের কাজের ওপর ঈমান বা বিশ্বাস রেখে জীবন যাপন করাই প্রকৃত মুসলমানের কাজ। যদি আল্লাহ্‌র কাজে এবং তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পথে না থেকে নিজেকে মুসলমান দাবী করে, আর আল্লাহ্ ও রাসূল প্রিয় মানুষদেরকে অ-মুসলমান মনে করে, তা হলে কি আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণ যোগ্য হবে?

এমন প্রশ্নের জবাবে অবশ্য বলতে হবে যে, না কখনও গ্রহণ যোগ্য হবে না এবং হতেও পারে না।

নিরক্ষর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ৪০ বছর বয়সে নবুওয়াত প্রাপ্ত হন। নবুওয়াত প্রাপ্তির পর ২৩ বছর পর্যন্ত তাঁর প্রতি পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হতে থাকে। এহেন উম্মী নবী হয়ে উঠেন মহানবী এবং বিশ্বনবীতে। তাঁর জীবদ্দশায় বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার সম্ভব হয়ে উঠেনি, যদিও আঁ হযরত (সা.) এর কাজই ছিল সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে শান্তির ধর্ম ইসলামের বাণী পৌঁছানো। কিন্তু সেই সুযোগ হয়নি বিধায় মহান আল্লাহ্ তা'লা বিশ্বব্যাপী সত্য ধর্ম ইসলামের প্রচার ও প্রসারের পরিকল্পনা গ্রহণ করে রেখেছেন ইসলামের খেলাফত প্রতিষ্ঠা চালু রাখার মাধ্যমে। ইসলামের মর্মবাণী সমগ্র জগতে যেন ক্রমাগত ভাবে পৌঁছে দেওয়া যায়।

উম্মতী নবী হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর প্রতি যে ইলহামটি হয়, সেটি আল্লাহ্ তা'লার মহা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কর্মসূচী বিশেষ। যেমন বলা হয়েছে যে, আমি তোমার প্রচারকে দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিব। এটি তো মহান আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি। প্রতিশ্রুতিকে কুরআনের ভাষায় ওয়াদা বলা হয়েছে। আর আল্লাহ্‌র ওয়াদাই সত্য। পৃথিবীর অনেক কিছুর পরিবর্তন হয় এবং ব্যতিক্রম হয়, কিন্তু আল্লাহ্‌র ওয়াদার ক্ষেত্রে কোন রূপ ব্যতিক্রম হয় না এবং হবেও না, হতে পারেও না। আরো উল্লেখ্য যে, তাক্‌ওয়াহীন ব্যক্তিরা এসব তত্বপূর্ণ বিষয় বুঝতে সক্ষম হবে না।

যারা বুঝতে সক্ষম নয়, তারাই সত্যের বিরোধিতা করাকে নেক কাজ মনে করে। যেমনটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সাথে তায়েফবাসীরা করেছিল। আর নবী করীম (সা.) তাদের জন্য দোয়া করেছিলেন, *আল্লাহুম্মাহদে কউমী ফাইন্নাহুম লা-ইয়ালামুন*–অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তাদেরকে আমার জাতিকে হেদায়াত দান কর, তারা নির্বোধ। ঐ যুগে অ-মুসলিমরা মনে করত তারা সঠিক পথেই আছে। আঁ হযরত (সা.) কে তারা নির্বোধ মনে করতো, নাউযুবিল্লাহ।

ঐ যুগে অ-মুসলিমরা মনে করত তারা সঠিক পথেই আছে। আঁ হযরত (সা.)কে তারা সঠিক পথের পথিক মনে করতো না। তাই বিরোধিতা করাটা পুণ্যের কাজ বলে মনে করতো। অর্থাৎ বিরোধিতা ছিল তাদের সওয়াবের কাজ। যেমনটি বর্তমান যুগে তাঁর শ্রেষ্ঠ উম্মত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সাথে বিরোধিতাকে সওয়াবের কাজ মনে করে।

অতএব আমাদের উচিত, আঁ হযরত (সা.) এর সুন্নতানুসারে সেই দোয়াটি মনযোগ দিয়ে পাঠ করা যে, *আল্লাহুম্মাহদে কাউমী ফাইন্নাহুম লা-ইয়ালামুন*। সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মেনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) সাম্প্রতিক কালে এক জুমুআর খুতবায় সেই দোয়াটির প্রতি আলোকপাত করেছেন যেন আমরা সেই দোয়া করতে থাকি।

সুতরাং বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার করা একমাত্র নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের উপরই ন্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার এই অনুকম্পা আহমদীয়া জামা'তকে কোন মানুষের বা সম্রাট অথবা কোন বড় রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়নি। এমন গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্ব মহান আল্লাহ্ তা'লা নিজ হস্তে প্রদান করেছেন।

অত:পর তিনি (আল্লাহ্) এক ইলহামের মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে জানান যে, "আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব"-এর কার্যক্রম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশায় শুরু হয়েছে আর এখনো অব্যাহত আছে। যেমন সাম্প্রতিক কালে (২০১২ সনে) আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ৫ম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) ইউরোপীয় পার্লামেন্টে ৩০টি দেশের প্রতিনিধিত্বকারী ৩৫০-এর অধিক অতিথির উপস্থিতিতে এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন এবং

গণমাধ্যমের উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। ইউরোপীয় পার্লামেন্টে হুযূর (আই.) এর ভাষণের পূর্বেই এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যুক্তরাজ্য, স্পেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও পাকিস্তানসহ বিশ্বের বেশ কয়েকটি গণমাধ্যম সংস্থার প্রতিনিধিগণ এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্বে ইসলামের ভূমিকা সম্পর্কিত সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন, ইসলামের মূল শিক্ষা হলো শান্তি।

তিনি বলেন : ইসলামের শান্তির বাণী হলো সার্বজনীন, এ কারণেই আমাদের আদর্শ ও বাণী হলো, "ভালবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয় কারো পরে"।

স্পেনিশ গণমাধ্যমের এক প্রতিনিধির প্রশ্নের উত্তরে হুযূর (আই.) বলেন, সূচনাতে সকল প্রধান ধর্মই শান্তির শিক্ষাই দিয়েছে আর এ কারণেই সত্যিকার মুসলমানরা বিশ্বের সকল নবী রাসূলের প্রতি বিশ্বাস রাখে।

তিনি আরো বলেন:

প্রত্যেক নবী একটি বাণীসহ এসেছিলেন– আর তা হলো খোদা এক ও অদ্বিতীয়।

মালটা গণমাধ্যমের এক প্রতিনিধি কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তরে মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন, আহমদী মুসলমানদের দায়িত্ব হচ্ছে মানুষকে খোদার প্রতি আহ্বান করা এবং পরস্পরের অধিকার প্রদানের বিষয়াদির প্রতি বিশ্বের সকল মানুষের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

আজ ধর্মীয় সম্প্রীতির প্রচেষ্টায় তিনি সম্প্রতি পোপ বেনেডিক্টের কাছে ব্যক্তি মারফত একটি পত্র পাঠিয়েছেন। তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন, বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের ধর্মীয় মতপার্থক্য ভুলে গিয়ে যে সকল বিষয় তাদের ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে তা নিয়ে ভাবা।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে ভাববার তৌফিক দিন, আমীন।

ইসলাম-ই আমাদের ধর্ম

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন:

"আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারাংশ ও সারমর্ম হলো- **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্**। এ পার্থিব জীবনে আমরা যা বিশ্বাস করি এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ও তাঁরই প্রদত্ত তওফীকে যা নিয়ে আমরা এ নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করবো তা হচ্ছে, আমাদের সম্মানিত নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) হলেন **'খাতামান্ নবীঈন'** ও **'খায়রুল মুরসালীন'** যাঁর মাধ্যমে ধর্ম পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং যে নেয়ামত দ্বারা সত্যপথ অবলম্বন করে মানুষ আল্লাহ্ তা'লা পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে তা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস রাখি, কুরআন শরীফ শেষ ঐশী-গ্রন্থ এবং এর শিক্ষা, বিধান, আদেশ ও নিষেধের মাঝে এক বিন্দু বা কণা পরিমাণ সংযোজনও হতে পারে না আর বিয়োজনও হতে পারে না। এখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন কোন ওহী বা ইলহাম হতে পারে না যা কুরআন শরীফের আদেশাবলীকে সংশোধন বা রহিত কিংবা কোন একটি আদেশকেও পরিবর্তন করতে পারে। কেউ যদি এমন মনে করে তবে আমাদের মতে সে ব্যক্তি বিশ্বাসীদের জামাত বহির্ভূত, ধর্মত্যাগী ও কাফির। আমরা আরও বিশ্বাস রাখি, সিরাতে মুস্তাকীমের উচ্চমার্গে উপনীত হওয়া তো দূরের কথা, কোন মানুষ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ছাড়া এর সামান্য পরিমাণও অর্জন করতে পারে না। আমরা আমাদের নবী (সা.)-এর সত্যিকার ও পূর্ণ অনুসরণ ছাড়া কোন ধরনের আধ্যাত্মিক সম্মান ও উৎকর্ষ কিংবা মর্যাদা ও নৈকট্য লাভ করতে পারি না।"

[ইযালায়ে আওহাম, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩৭-১৩৮]

নবীনদের পাতা-

কুরআন ও প্রযুক্তি

আঁখি আহমদ

বিজ্ঞানময় এই কুরআন নাজিল হয়েছে মুসলমানদের ওপর কিন্তু মুসলমানরাই এর বিজ্ঞান না বুঝার এবং একে রিসার্চ না করার ফলে প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লার ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে, আকাশের আবরণ খুলে ফেলা হবে। আমরা যদি একটু ভেবে দেখি তাহলে দেখতে পাই যে, আল্লাহ্‌র এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণতা লাভ করেছে। বর্তমান আমরা এমন একটি যুগে বাস করছি যেখানে প্রযুক্তির ব্যবহার ছাড়া জীবন ধারণ সম্ভব নয়। এখন বিশ্বব্যাপী গবেষকরা গবেষনা করে নতুন নতুন আবিষ্কারাদি আমাদের সামনে উপস্থাপন করছে।

আজ আকাশকে ভেদ করে কত কিছুই না আবিষ্কার করছে। কম্পিউটার, ফ্যাক্স, স্যাটেলাইট, মোবাইল, নেটওয়ার্ক কত কিছুই না আবিষ্কার হচ্ছে অথচ আজ থেকে পনের' শত বছর পূর্বেই মহানবী (সা.)-কে মহান খোদা তা'লা এসব সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছিলেন। তাই নি:সন্দেহে বলা যায় কুরআনের সাথে প্রযুক্তি অতপ্রতভাবে জড়িত।

যেভাবে পবিত্র কুরআনে সমদ্র সৃষ্টি সম্পর্কে বলা হয়েছে 'তিনিই কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন সমুদ্রকে, যাতে তা থেকে তোমরা তাজা মাংস খেতে পার' (সূরা নাহল: আয়াত ১৫)।

এই আয়াত থেকে বুঝা যায়, খোদা তা'লা সমুদ্র সৃষ্টি করে তাকে অসংখ্য মঙ্গলের ও উপকারের জন্য বৃহৎ ও প্রশস্ত করেছেন। সমুদ্র থেকে আমরা অনেক কিছু পেয়ে থাকি। এরপর খোদা তা'লার নিপুন হিকমত দ্বারা মনি-মুক্তাকে গভীর পানিতে ঝিনুকের গর্ভে সৃষ্টি করে রেখেছেন। যেভাবে বলা হয়েছে 'উভয় দরিয়া থেকে প্রবাহিত হয় মতি ও প্রবাল। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে' (সূরা রহমান: আয়াত ২৩-২৪)।

আলোচ্য আয়াতে যে প্রবালের কথা বলা হয়েছে এ সম্পর্কে কোন কোন বৈজ্ঞানিক বলেন যে, এটিও একপ্রকার মনি-মুক্তা, যা মুক্তা থেকে হালকা ও ক্ষুদ্রাকার হয়ে থাকে। পৃথিবীতে বর্তমান বিজ্ঞানীরা যা কিছু আবিষ্কার করছে তার সবই কিন্তু আল কুরআনে সেই পনেরশ বছর আগেই লিখিত ছিল।

আমরা কুরআন পড়ি না বলেই এসব আবিষ্কারাদি আমাদের কাছে নতুন মনে হচ্ছে। আর কুরআন পড়লেও এর সম্পর্কে গভীর ভাবে চিন্তা করি না, যার ফলে প্রযুক্তি থেকে মুসলমানরা এখনো অনেক পিছিয়ে রয়েছে। অথচ এই বিজ্ঞানময় কুরআন নাজিল হয়েছে মুসলমানদের ওপর কিন্তু মুসলমানরাই এর বিজ্ঞান না বুঝার এবং একে রিসার্চ না করার ফলে প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

আল্লাহ্ বলছেন, তিনি আকাশকে খুলে দিবেন। তাই যারা এ কথার মর্ম বুঝতে পেরেছে তারা তার সদ্ব্যবহার করেছে। যারা বুঝেনি তারা অন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। আজকে মুসলমানরা শুধু তোতা পাখির মত কুরআন মুখস্ত করছে কিন্তু কুরআনের মূল মর্মবাণী সম্পর্কে গাফেল রয়েছে। যেহেতু আমরা পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে কাজে লাগাচ্ছি না তাই আমরা অনেক পিছিয়ে গেছি।

মহান খোদা তা'লা আমাদের সকলকে পবিত্র কুরআন বুঝার এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নেয়ার তৌফীক দান করুন, আমিন।

"যদি কেউ পর্দা পরিত্যাগ করে তাহলে এর অর্থ হচ্ছে সে কুরআনের অবমাননা করে"

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত– একটি পর্যালোচনা

মুহাম্মদ আব্দুস সালাম, সিরাজগঞ্জ

পটভূমি : বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর শিক্ষা অনুযায়ী নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত সহ অন্যান্য বিষয়ের ওপর আমলকারী একটি আধ্যাত্মিক জামা'তের নাম আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত। ধর্মের নামে রাজনীতি বা বলপ্রয়োগে এ জামা'ত বিশ্বাসী নয় বরং অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী। ইসলামের খাঁটি শিক্ষা এবং এক ঐশী খিলাফতের ছায়ায় ঐক্যবদ্ধ করার জন্য শেষ যুগে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ইমাম মাহ্‌দী (আ.) আসবেন বলে মহানবী (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে যুগ ইমাম বা ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর আগমনের যে লক্ষণগুলো বর্ণিত হয়েছে তা পূর্ণতা লাভ করায় কাদিয়ান নিবাসী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)কে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্‌দী বলে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বিশ্বাস করে। তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ইলহাম পেয়ে ১৮৮৯ সনে নিজেকে ইমাম মাহ্‌দী দাবী করেন এবং হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর 'আহমদ' নাম অনুযায়ী আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেন।

ইসলাম প্রচার : তৎকালীন সময়ে খ্রিষ্টান মহল থেকে ইসলামের ওপর যে হামলা হচ্ছিল হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) তা নজির বিহীন ভাবে প্রতিহত করেন। তিনি সভা-সমাবেশ আহ্বান করে ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য শান্তিপূর্ণ উপায়ে ব্যাখ্যা করে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং পাশাপাশি খৃষ্ট ধর্মের অসারতা প্রমাণ করতে থাকেন। তিনি তাঁর (আ.) জীবদ্দশায় বিশ্বের বহু সুধী ব্যক্তিকে পত্রের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত দেন। তন্মধ্যে মহারানী ভিক্টোরিয়া এবং রুশ দার্শনিক লিও টলস্টয়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ইসলামের পক্ষে ৮৮ খানা পুস্তক রচনা করেন।

১৯০৮ সালে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর মৃত্যুর পর হাদীস অনুযায়ী এই জামা'তে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মুবাল্লিগ প্রেরণ করে অমুসলিমদের মধ্যে ইসলামের খাঁটি শিক্ষা প্রচার করে চলেছে। এ পর্যন্ত প্রায় শতাধিক ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ প্রকাশ করে ঐ ভাষার মানুষের মধ্যে পবিত্র কুরআনের আলো বিতরণ করে চলেছে। ইসলামী সাহিত্য সম্বলিত পত্রিকা বিশ্বের বহু ভাষায় নিয়মিত প্রকাশিত ও প্রচারিত হচ্ছে।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মহানবী (সা.)-কে অবশ্যই খাতামান্ নবীঈন বলে বিশ্বাস করে; কেননা, এটা পবিত্র কুরাআনের ঘোষণা। পূববর্তী বুযুর্গানে দ্বীন 'খাতামান্ নবীঈন, এর যে ব্যাখ্য দান করেছেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তার সাথে সম্পূর্ণ একমত।

এম,টি,এ নামক একটি টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে এই জামা'ত দিনরাত ২৪ ঘন্টা বিভিন্ন ভাষায় ইসলাম প্রচার করে যাচ্ছে। এছাড়া রেডিও-এর মাধ্যমেও ইসলাম প্রচার করে চলেছে। এই জামা'তের দাওয়াতে লাখ লাখ অ-মুসলিমরা ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করে চলেছেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

মানবতার সেবা : আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তার সামর্থমত মানবতার সেবায় রত। 'হিউম্যানিটি ফার্স্ট' নামক আন্তর্জাতিক সেবা সংস্থার মাধ্যমেও এ জামা'ত বিশ্বব্যাপী মানবতার সেবা করে যাচ্ছে।

অর্থের উৎস : সদস্যদের মাসিক চাঁদা, যাকাত, ওসিয়্যত ইত্যাদি যাকাত থেকে যে অর্থ আসে তা দিয়েই জামা'ত তার যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করে থাকে। এ জামা'তের সদস্য ব্যতীত কারো কাছ থেকে কোন অর্থ গৃহীত হয় না।

অভিযোগের জবাব : আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মহানবী (সা.)-কে অবশ্যই খাতামান্ নবীঈন বলে বিশ্বাস করে; কেননা, এটা পবিত্র কুরাআনের ঘোষণা। পূববর্তী বুযুর্গানে দ্বীন 'খাতামান্ নবীঈন, এর যে ব্যাখ্য দান করেছেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তার সাথে সম্পূর্ণ একমত। এই জামা'ত মহানবী (সা.) এর শিক্ষাকেই অনুসরণ করে এবং তাঁর (সা.) শিক্ষাই প্রচার করে।

বিনীত নিবেদন : হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) আসলে তাঁকে মানতে হবে এটা যেমন সত্য তাঁর বিরোধীতা হবে এটাও সত্য। তাই শুধু বিরোধীদের কথা না শুনে আমাদের বিষয়টি আমাদের কাছ থেকে জেনে নেওয়াটাই মনে হয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

আহমদী মুসলিম জামা'ত সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে যোগাযোগ করতে পারেন নিম্নের ঠিকানায়:

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪, বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১

ওয়েবসাইট www.alislam.org,
www.mta.tv,
www.ahmadiyyabangla.org

পাঠক কলাম

[পাঠক কলামের এই আয়োজনে এবারের বিষয় ছিল
“ইসলামে নারীর অবদান”
পাঠকদের পাঠানো লেখা দিয়ে সাজানো হলো পাঠক কলামের এই অংশ]

বিশ্বের সকল কল্যাণের অর্ধেক করেছে নারী আর অর্ধেক নর

নারী পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী। আর তা যদি পুণ্যবতী হয় তাহলে একজন মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। এ দুনিয়ার সবকিছুই মূল্যবান সম্পদে পরিপূর্ণ, কিন্তু সর্বাপেক্ষা মূল্যবান জিনিস হচ্ছে পূণ্যবতী নারী। ইসলাম ধর্মেই কেবলমাত্র নারী জাতিকে সম্মানের আসনে বসিয়েছে। বিবাহের ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্ম ধার্মিকা নারীকে বেশ প্রাধান্য দিয়েছে। কারণ পুণ্যবতী ধার্মিকা নারী পুণ্যবান সন্তান জন্ম দেয়ার একটি উত্তম মাধ্যম। একটি ভবিষ্যত উত্তম জাতি উপহার দিতে পারে উত্তম ও পুণ্যবর্তী মায়েরাই।

খোদা তা'লা কর্মের ফলাফলের দিক থেকে স্ত্রী পুরুষকে সমতার ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দুনিয়ার সম্পদের প্রাচুর্যে ঐশ্বর্য নেই, ঐশ্বর্য আছে সন্তুষ্টিতে ও উত্তম তাক্ওয়ার মধ্যে। মু'মিন নারীরা তো খুবই সন্তুষ্টির অধিকারী হয় এবং স্বল্পে সন্তুষ্টির নারী স্বামীর শ্রেষ্ঠ উপহার। নারী অধিকার অলঙ্ঘনীয়। সূরা আন্ নিসা নারী অধিকারের রক্ষা কবচ। ইসলাম এমন একটি পবিত্র ধর্ম যা নারী-পুরুষ উভয়ের অধিকার অত্যন্ত সুন্দর ভাবে সংরক্ষণ করে একটি সুন্দর সমাজ গঠনে উভয়ের অবদান রাখার ওপর গুরুত্ব দেয়। ইসলামে নারীর অবদানের শেষ নেই। পর্দার ভিতরে থেকেই সংসার সামলানো, সন্তানদের উত্তম তরবিয়ত থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে পর্যন্ত তার অপরিসীম অবদান রেখেই চলেছে। তার এ অবদান অনস্বীকার্য। সুমিষ্ট ফলের আশা আমরা তখনই করতে পারি যদি গাছটিও উত্তম হয়!!

সকল সৎকর্মের প্রেরণাদায়ী হচ্ছে নারী। কবির ভাষায়– “এ বিশ্বের সকল কল্যাণের অর্ধেক করেছে নারী আর অর্ধেক করেছে নর”। আমাদের নবীকুল সম্রাট হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁকেও খোদা তা'লা একজন নারীর গর্ভেই কিন্তু সৃষ্টি করেছেন। যাঁকে পয়দা না করলে বিশ্বের কোন কিছুই সৃষ্টি হতো না। দুনিয়ার বাদশাহ, জ্ঞান-গুণী থেকে সকল মুজাদ্দিদ ও রাজনীতিবিদ, বিজ্ঞানী ইত্যাদি সকলেরই জন্ম নারীর গর্ভে! কোন পুরুষেই এমন সম্মানিত আসনের দাবী করার যোগ্যতা রাখতে পারেন না! এজন্য পৃথিবীর সকল সমুদ্রের পানি কালি করে লিখেও এ সম্মানের ও মর্যাদার কথা শেষ করা যাবে না। কিন্তু মুখে আর কাগজে-কলমের আস্ফালন! বুলি নারীর মূল্যায়ণ? সৃষ্টির আদিকাল থেকে বর্তমান সভ্য সমাজে (ভবিষ্যতের কথা লিখতে চাই না) আশে-পাশের ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সমাজের সকল অংশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারীর কিন্তু মূল্যায়ণ সেই আইয়্যামে জাহেলিয়াতের আধুনিক রূপ! সময়ের বিবর্তনে কেবলমাত্র “তরিকাটি ভিন্ন? বর্তমান পৃথিবীতে নারী অধিকার নিরানব্বইটি পরিবারে আজো সেই ভিন্ন তরীকায় নারীদের অবমূল্যায়ণ!! নারী প্রতিষ্ঠান, নারী বিশ্ববিদ্যালয়, নারীদের নিজস্ব পত্রিকা, মহাকালে পদার্পণ, হিমালয়ে উঠা কিন্তু সম্মানের দিকে অস্পষ্ট ভাবে অবমূল্যায়ণই বলবো আমি!! কি হয়েছে? মেয়ে জন্মেছে!! যাক আমরা আহমদীরা কিন্তু ভিন্ন। আল্লাহ্ তা'লা ইসলাম ধর্মের অনুসারী প্রত্যেক নারীকে ইসলামের উচ্চ আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পন্ন ধার্মিক সন্তান দানের মাধ্যমে ইসলামের বিজয় দান করুন এবং বিশ্বের সকলকেই ‘নারীদের অবাদনকে’ সঠিক মূল্যায়ণ করার তৌফিক দিন, আমীন।

আনোয়ারা বেগম, রংপুর

ইসলামে নারীর অবদান

আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন নর ও নারী উভয়কে একই কান্ড থেকে। দয়া, মায়া, স্নেহ, মমতা, আশা, আকাংখা উভয়েরই সমান। ইসলামের পূর্বে নারীর মর্যাদা সমাজে স্বীকৃত ছিল না। আরবে নারীদের প্রতি বর্বরতা চরমে পৌঁছে ছিল। ইউরোপে অসংখ্য নারীকে ডাইনি বলে হত্যা করা হয়েছে। হিন্দু সমাজে ধর্মের নামে নারীকে সহমরণে চিতায় তুলে ভস্ম করা হয়েছে। যে ইউরোপ আজ নারী স্বাধীনতা দানে মহান মর্যাদার দাবীদার তারাও নারীকে করেছে পন্য। উন্মত্ত মানসিকতায় নারীও আজ দিকভ্রান্ত। সভ্যতার আরো যেটুকু তারা লাভ করেছে তার সবই প্রার্থীর ভোগ বিলাস ও জৈবিকতায় সীমাবদ্ধ। অনাচার মাত্র ছড়িয়ে গেছে। চরম অনাচার, সীমাহীন ঐদ্ধত্য ও অবাধ্যতার কারণে অতীতে বহু জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ইতিহাস ঘাটলে ও ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করছে না আজিকার সভ্য সমাজ।

ইসলামে নারীর অবদান ও তাদের প্রশংসনীয় ভূমিকা অত্যুজ্জ্বল, তাতে সন্দেহ নাই। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে আলোচনা করলে আমরা

দেখতে পাই, বিশ্বের মহানতম মহাপুরুষ শান্তিদূত ও শান্তির চিরস্থায়ী কাঠামো নির্মাণকারী সত্তা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর অনন্য সাধারণ চারিত্রিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েই যা ইসলামই পূর্ণ কুরাইশ বংশের উচ্চ মর্যাদাশীল ধনাঢ্য মহিলা হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা.) নবুওয়াতের পূর্বেই হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর চরণে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন। শুধু তাই নয় তাঁর যাবতীয় ধন সম্পদ তুলে দিয়েছিলেন হুযূর (সা.)-এর হাতে। তিনি সেই একমাত্র নারী যিনি সর্ব প্রথম ইসলাম কবুল করেন এবং আজীবন হুযূর (সা.) এর পাশে থেকে সার্বক্ষণিক সাহস ও সহযোগিতা প্রদান করেন।

হুযূর (সা.)-এর ফুফাত বোন হযরত জয়নবের কথা আমরা জানি–হযরত মুহাম্মদ (সা.) সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণার্থে যখন মুক্ত কৃতদাস হযরত যায়েদের জন্য তাঁর বিয়ের প্রস্তাব করেন তখন তিনি তা মেনে নেন। ইসলামের আদর্শে অসখ্য নারী হাসি মুখে কুরবানী পেশ করতে দ্বিধা করেন নি। ওহুদের যুদ্ধে হযরত মুহাম্মদ (সা.) আহত হয়েছিলেন এবং খবর রটে গিয়েছিল যে হুযূর (সা.) মারা গেছেন। মদীনা হতে এক নারী সত্য যাচাইয়ে উদভ্রান্তের মত ছুটতে থাকেন আর যাকেই পায় তাকেই জিজ্ঞেস করতে থাকেন হুযূর (সা.) এর খবর কি? একজন বলেন–আপনার স্বামী শহীদ হয়ে গেছেন– সে নারী বলেন, আমি স্বামীর খবর জানতে চাই না, বলো হুযূর (সা.) কেমন আছেন? আরেকজন বলেন, আপনার ভাই শহীদ হয়ে গেছেন– তিনি বলেন, আমার ভাই-এর খবর জানতে চাই না– বলো হুযূর (সা.) কেমন আছেন? যখন তিনি জানতে পারেন যে, মহানবী (সা.) নিরাপদ আছেন, তখন সেই মহিলার জবাব ছিল, আমি আর কিছুই চাই না যেহেতু মহানবী (সা.) নিরাপদ আছেন এটাই আমার জন্য যথেষ্ঠ, এইতো আমার চাওয়া।

মক্কা হতে হিজরত করার সময় হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর এক মেয়ে (হযরত জয়নব)কে তীর মেরে তারা গর্ভের সন্তানসহ শহীদ করা হয়। ইসলাম গ্রহণ করার কারণে অসংখ্য নারী অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, শহীদ হয়েছেন অসংখ্য নারী। হযরত আয়েশা (রা.)-এর বিরুদ্ধে কুৎসার কারণে অবর্ণনীয় মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন তা-ও ছিল আল্লাহ্‌র বিধানে ইসলামের সুন্দরতম শিক্ষা বিশ্বে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার কারণেই। ঘরে বাইরে যুদ্ধের মাঠে সর্বত্রই ইসলামের জন্য নারীর ভূমিকা সমোজ্জ্বল। হযরত আয়েশা (রা.) ছিলেন ধর্মের শিক্ষিকা। সাহাবাগণ (রা.) তাঁর কাছ থেকে সূক্ষ্ম বিষয়ে পরামর্শ নিতেন। জটিল বিষয়ের সমাধান তাঁর (রা.) কাছ থেকে জেনে নিতেন। হযরত খাওলার বীরত্বের ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখা রয়েছে।

বড় পীর হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রা.)-কে স্বর্ণমুদ্রার লোভ দমাতে পারেনি মায়ের আদেশে সত্য বলা হতে। সৈয়দা নূসরাত জাহান বেগম সাহেবা (রা.) কে আল্লাহ্ পাক মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর জীবন সঙ্গিনী করেছিলেন ইসলামের আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠার কারণেই। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) ও তাঁর তরবিয়তেই গড়ে উঠেছিলেন। আল্লাহ্‌র ফজলে ইসলামে নারীর ভূমিকা সব সময়ই গৌরবোজ্জ্বল। লন্ডনের আল ফজল মসজিদ নারীদের চাঁদায় নির্মিত। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর আহ্বানে আহমদী নারীরা নিজেদের অলংকার খুলে দিয়েছিলেন হাস্য বদনে। আজো নারীরা ক্লান্ত নয়, ইসলামের জন্য নিজেদের ধন জীবন সুখ বিসর্জন দিতে। অসংখ্য শহীদদের ঘরে বুকে পাথর বেধে জীবন কাটাচ্ছেন বহু নারী। তবু তারা গর্বিত, সত্য, সুন্দর ও ইসলামের জন্য কুরবানী পেশ করে তারা প্রদীপ্ত। অসংখ্য নারী কুরবানী করেছেন তাদের গর্ভের সন্তানদের আগামী দিনে ইসলামের জন্য জীবন উৎসর্গকারী সেবক তৈরী করতে। স্যার জাফরুল্লাহ্ খানের মত জগৎ বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব - তাঁর মায়ের হাতেই তরবিয়ত প্রাপ্ত। হযরত খলীফা আউয়ালের জননী সারা জীবন কুরআন শিখিয়েছেন এবং খলীফা আসীরানের প্রাথমিক তরবিয়ত তাঁর জননীর হাতেই। হযরত আম্মাজান নূসরাত জাহান বেগম (রা.) সাহেবা সন্তানকে কিভাবে তরবিয়ত দান করেছেন তা আহমদীয়াতের ইতিহাসে সুরক্ষিত। মোট কথা ইসলামে নারীর অবদান কোন অবস্থাতেই নগণ্য নয়। হযরত রাবেয়া বশরীর ঘটনা সবার জানা। ইসলামে নারীর ভূমিকা ও অবদান সর্বদাই প্রশংসনীয় ও উজ্জ্বল।

মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, বড়চর

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

পাক্ষিক আহমদী'তে প্রতি মাসের শেষ সংখ্যায় পাঠকদের লেখা নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে **'পাঠক কলাম'**।

আগামী পাঠক কলামের বিষয়-

"ইসলামে হজ্জের গুরুত্ব"

আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে।

লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৩-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-

সম্পাদকঃ পাক্ষিক আহমদী
(পাঠক কলাম)
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১
e-mail:
pakkhik_ahmadi@yahoo.com

TO ALL PARTICIPANTS OF JALSA SALANA UK

PROGRAMME

47th JALSA SALANA 2013

(Annual Convention) U.K.

Note : All Urdu speeches will be translated simultaneously into English, French, German, Arabic, Bangla, Indonesian, Bosnian, Russian, Turkish, Spanish and some other languages.

Friday 30th August

11.30 Lunch and preparation for Jumuah prayers

16.25 Hoisting of Liwa-e-Ahmaddiyyat (Ahmaddiyya Flag)

OPENING SESSION

16.30 Recitation from the Holy Quran, Urdu translation and

Urdu Poem

Inaugural address

by Hadhrat Amirul Momineen

Khalifatul Masih V(aba)

Silent Prayer

20.00 Maghrib and Isha Prayers

20.30 Dinner

13.00 Jumuah and Asr Prayers20

Saturday 31st August

Tahajjud Prayer 4.00 Adhan 4.43 Fajr Prayer 5.00

Darsul Quran 5.15 Breakfast 8.00

SECOND SESSION

10.00 Recitation from the Holy Quran, Urdu translation and Poem (Urdu)

11.30 Response to criticism on the Holy Qur'an (English)

Dr. Iftikhar Ahmad Ayaz (OBE),

Chairman Human Rights Committee UK

11.20 Urdu Poem

12.00 Hadhrat Khalifatul Masih V (aba) arrives in

Ladies Jalsa Gah.

Recitation from Holy Quran, Translation and Urdu Poem

Address by Hadhrat Amirul Momineen Khalifatul Masih V (aba)

13.30 Zuhr and Asr Prayers. 14.00 Lunch

THIRD SESSION

15.00 Short speeches by distinguished Guests.

16.00 Recitation from Holy Quran, Translation and Urdu Poem

Address by Hadhrat Amirul Momineen

Khalifatul Masih V(aba)

20.00 Maghrib and Isha Prayers 20.30 Dinner

(Will be transmitted live from Ladies Jalsa Gah)

10.50 Remembrance of God - source of comfort for hearts

Mr. Jameel ur Rehman Rafiq, (Urdu)

Principal Jamia Ahmadiyya Rabwah

10.20 Life of Hazrat Maulana Sher Ali Sahib(ra) (Urdu)

Mr. Ataul Momin Zahid, Professor Jamia Ahmadiyya UK18

Sunday 1st September

Tahajjud Prayer 4.00 Adhan 4.45 Fajr Prayer 5.00

Darsul Hadith 5.15 Breakfast 8.00

FOURTH SESSION

10.00 Recitation from Holy Quran, Translation and Urdu Poem

10.50 The Companion's love for the Holy Prophet (saw) (Urdu)

Syed Mubashar Ahmad Ayaz, Research Cell Rabwah

11.20 Urdu Poem

11.30 The Passion of the Promised Messiah (as) (Urdu) for the service of Islam

Mr Ataul Mujeeb Rashed, Imam Fazl Mosque and Missionary Incharge UK

12.00 100 Years of the Ahmadiyya Community in UK (English)

Mr.Rafiq Ahmed Hayat, Amir Jama'at Ahmadiyya UK

12.45 Announcements and Preparation for Bai'at

13.00 International Bai'at (Initiation Ceremony)

13.30 Zuhr and Asr Prayers. 14.00 Lunch

FINAL SESSION

15.00 Short speeches by distinguished Guests.

16.00 Recitation from the Holy Quran,Translation, Arabic

Qaseeda and Urdu Poem

Concluding Address by Hadhrat

Amirul Momineen Khalifatul Masih V(aba)

Silent Prayer

Academic Award distribution Ahmadiyya Peace Prize announcement 10.20 And hold Fast, all together, by the rope of Allah (Urdu)

Mr. Muhammad Karim ud Din Shahid,

Nazim Irshad Waqf e Jadid Qadian17

PROGRAMME OF JALSA SALANA

(Ladies Section)

All other programmes will be transmitted simultaneously

from the Men's Jalsa Gah to Ladies Jalsa Gah

Saturday 31st August

10.00 Recitation from Holy Quran, Urdu Poem and Qaseeda

10.20 Pledge of the Lajna and its requirements (Urdu)

Mrs. Saaeha Ma'az

10.55 The Impact of the Message of the Promised Messiah

on an Ahmadi woman

Mrs. Michelle Rehman

11.55 Announcements

12.00 Hadhrat Khalifatul Masih V (aba) arrives in

Ladies Jalsa Gah.

Address by Hadhrat Amirul Momineen

Khalifatul Masih V (aba)

(Programme will be transmitted live from Ladies Jalsa Gah) (English)

Silent Prayer

10.45 Urdu Poem

11.20 Urdu Poem

11.30 Requirements for the respect for Khilafat and

Nizam e Jam'at (Administration of the Community)

Mrs. Fariha Khan (Urdu)

Recitation from Holy Quran, Translation, Urdu Poem,

Qaseeda and Translation

Academic Award distribution

ALLAH HAS PREPARED NATIONS WHO WILL COME AND JOIN THIS JAMA'AT IN THE NEAR FUTURE (Promised Messiah (as))

IT ACADEMY

৩য় তলা, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর দারুত-তবলীগ কমপ্লেক্সে জামা'তের শিক্ষিত সদস্য/ সদস্যাদের কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে একটি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার (আই.টি একাডেমি) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গত ৯ই ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে এটি উদ্বোধন করা হয়।

আমাদের বিশেষত্বঃ

১. দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা পরিচালিত
২. প্রত্যেকে শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা কম্পিউটার
৩. ন্যুনতম কোর্স ফি
৪. মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের ব্যবহার
৫. সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা
৬. প্রত্যেক ক্লাশের পূর্বে লেকচার শিট প্রদান
৭. ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা
৮. কোর্স শেষে সার্টিফিকেট প্রদান

আমাদের কোর্স সমূহঃ

1. MS Office with internet
2. Hardware Maintenance and Troubleshooting
3. Web page Design
4. Elementary English
5. Familiar with Office Etiquette & Manners

ভর্তির যোগ্যতা ও ফিসঃ

১. ন্যুনতম এস.এস.সি পাশ,
২. কোর্স বাবদ প্রদেয় ঃ ভর্তি ফি -১০০.০০ টাকা, কোর্স ফি -৫০০.০০ টাকা এবং সার্টিফিকেট ফি -১০০.০০ টাকা। সর্বমোট ৭০০.০০ টাকা।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুনঃ

সৈয়দ খালেদ হাসান
ইন্সট্রাক্টর, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৫৫৮৩১৯৬২৬, ০১৭১২৫১২৪৬২
ই-মেইল ঃ itaamjb@gmail.com, khaleditacademy@gmail.com

মোহাম্মদ ইউনুস আলী
কায়েদ, মখোআ ঢাকা
ইনচার্জ, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৭২৭৭৭৬৮৮৩
ই-মেইল ঃ mdyounus.ali@gmail.com

সংবাদ

তারুয়া জামা'তে বিশেষ ইফতারী আয়োজন

গত ২৭/০৮/২০১৩ ২৭ রমযান রোজ শনিবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তারুয়া মোল্লাপাড়া হালকায় বিশেষ ইফতারের আয়োজন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

উক্ত অনুষ্ঠানে তারুয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব বাদল সাদির সহ পরিষদের মেম্বারগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া স্থানীয় নন আহমদী ভাই সহ মোট ২৭ জন উপস্থিত ছিলেন। আছর নামাযের পর মওলানা শামসুদ্দিন মাসুম দরসে কুরআন প্রদান করেন। উপস্থিত মেহমানগণ মনোযোগ সহকারে দরসে কুরআন শোনেন।

কুরআন দরসের পর দোয়া পরিচালনা করেন মৌলানা সাহেব, সকল মেহমানগণই দোয়াতে সমিল হন। তারপর সকলের মাঝে ইফতার পরিবেশন করা হয়।

চেয়ারম্যান সাহেব মাগরিব নামায আমাদের সাথেই আদায় করেন। বিদায়ের সময় চেয়ারম্যান সাহেব বলেন যে, ধর্ম প্রত্যেকের, উৎসব সবার। তিনি সকলকে সালাম দিয়ে দোয়ার আবেদন রেখে বিদায় নেন। নন আহমদী ৬০টি পরিবারের মধ্যে ইফতার দেওয়া হয়। সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন জনাব ইব্রায়েতুল হাসান।

জহির আহমদ মিয়াজী

শুভ বিবাহ

প্রবীন আহমদী ও বুযুর্গ মরহুম মির্যা আলী আখন্দ-এর দৌহীত্রী সামিরা রাহাত মোহনা, পিতা-মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান, (কায়েদ উমুমী, মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ) অষ্টগ্রাম হাউজ, ২০/৫২ রূপনগর আবাসিক, মিরপুর, ঢাকা-এর সাথে সুন্দরবন মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র সাবেক যয়ীমে আলা জনাব আহমদ আলী মোল্লার পুত্র জনাব সালেহ মোহাম্মদ জাকারিয়া (মিঠু), যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা-এর শুভ বিবাহ ০২/০৮/২০১৩ শুক্রবার বাদ জুমুআ ৩,৫০,০০০/- (তিনলক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানা ধার্যে মিরপুর মসজিদে সুসম্পন্ন হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

এই বিয়ে যেন বা-বরকত ও কল্যাণকর হয় সেজন্য সকলের কাছে দোয়ার আবেদন জানানো যাচ্ছে।

-মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান

লাজনা ইমাইল্লাহ্ সাতক্ষীরায় ৪র্থ বার্ষিক ইজতেমা সম্পন্ন

গত ০৫/০৭/২০১৩ রোজ শুক্রবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ সাতক্ষীরার ৪র্থ বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। ইজতেমায় সভানেত্রী ছিলেন রেবেকা মোবাশ্বের, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ সাতক্ষীরা।

প্রধান অতিথি ছিলেন দীনা নাসরিন। অনুষ্ঠানের শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করেন শিউলী ইদ্রিস। আহাদনামা পাঠ করান প্রধান অতিথি। নযম পরিবেশন করেন ফাতেমাতুজ জোহুরা ঐশী। কুরআন তেলাওয়াত, নযম, দ্বীনিমালুমাত, কুইজ ও খেলাধুলার প্রতিযোগিতা নেয়া হয়। ইজতেমায় লাজনা, নাসেরাত ও মেহমানসহ ৪১ জন উপস্থিত ছিলেন। ইজতেমায় নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন ওয়াকফে জিন্দেগী জনাব শামসুর রহমান। সবশেষে পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার পরিসমাপ্তি ঘটে।

ফাতেমাতুজ জোহুরা

Require Hunting Experienced talent for reputed Garments Industry (Knit & woven)

(a) Commercial officer
(b) Merchandiser
(c) Marketing officer
(d) Driver
(e) Receptionist

Demerits & Disqualification:

(a) In experienced
(b) Dishonesty

Apply to website : job @ kento.org

Kento Asia Ltd.

শোক সংবাদ

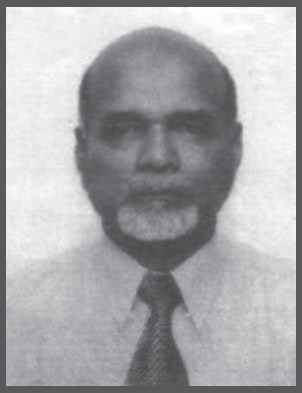

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আমাদের চট্টগ্রাম আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সাবেক আমীর ***প্রকৌশলী জনাব মাহমুদ হাসান সিরাজী*** সাহেব গত ৩১ জুলাই, ২০১৩ ইং রোজ- বুধবার রাত ১০.৪০ ঘটিকায় ঢাকাস্থ সিএমএইচ-এ চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। মৃত্যুকালে মরহুমের বয়স হয়েছিল ৬৪ বৎসর। মৃত্যর পরের দিন আর্থাৎ ০১ আগষ্ট বাদ যোহর চট্টগ্রামস্থ বায়তুল বাসেত মসজিদ প্রাঙ্গনে তার নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়, জানাযা শেষে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত চট্টগ্রামের এশিয়ান হাইওয়ের পার্শে অবস্থিত কবরস্থানে মরহুমের দাফন সুসম্পন্ন হয়।

মরহুমের জানাযা এবং দাফনে চট্টগ্রামের আহমদী ও স্থানীয় বহু গণমাণ্য অ-আহমদীগণও অংশ গ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য যে, মরহুম নিয়মিত তবলীগকারী, অসম্ভব ধৈর্যশীল, সুন্দর সাহসিকতার মানুষ এবং নেক কাজের প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়ে আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে সবসময় প্রথম সারিতে থাকার চেষ্টা করতেন।

আমরা পাক্ষিক আহমদী পত্রিকার মাধ্যমে সকলের কাছে মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করি এবং আল্লাহ্ তা'লা যেন মরহুমকে বেহেস্তের উচ্চ মোকাম ও পরিবারবর্গকে সবরে জামিল দান করেন। আমীন

খালিদ আহমদ সিরাজী
সেক্রেটারী ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রাম।

বিশেষ দোয়ার আবেদন

আমাদের এক মাত্র কন্যা ***'আফিয়া আহমদ সপ্তর্ষি'*** (বয়স-দুই বছর চার মাস) ওয়াকফে নও, সে গত ২ আগষ্ট থেকে ২৪ আগষ্ট ২০১৩ পর্যন্ত গুরুতর অসুস্থ হয়ে ঢাকার শিশু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর এখন বাসায় রয়েছে।

মহান আল্লাহ্ পাকের অশেষ কৃপায় বর্তমানে অনেকটাই আরোগ্য লাভ করেছে, আলহামদুলিল্লাহ। তার পূর্ণ আরোগ্যের জন্য সকলের কাছে বিনীত ভাবে দোয়ার আবেদন করছি।

মহান আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদের একমাত্র কন্যাকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং দীর্ঘায়ূ দান করেন, সেই সাথে সে যেন বড় হয়ে ইসলাম ও আহমদীয়াতের সত্যিকারের সেবিকা হতে পারে, সেজন্য সকলের কাছে বিনীতভাবে দোয়াপ্রার্থী।

মাহমুদ আহমদ সুমন
ফারহানা মাহমুদ তন্বী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তেজগাঁও

তেজগাঁও জামা'তে পবিত্র রমযানে বিশেষ কার্যক্রম

পবিত্র রমযান মাস উপলক্ষে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তেজগাঁও-এর পক্ষ থেকে কেন্দ্রের দিক-নির্দেশনা মোতাবেক বিশেষ কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। এতে নিয়মিত বাজামাত তারাবী নামাজ আদায়, দারসে কুরআন, সকলে মিলে একত্রে ইফতার, খোদ্দাম-আতফালদের তালিমী ক্লাস, সকলের কাছ থেকে তাহরীকে জাদীদ, ওয়াকফে জাদীদ এবং অন্যান্য চাঁদা আদায়ের বিশেষ পদক্ষেপসহ বিভিন্ন তরবীয়ত মূলক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। এছাড়া পবিত্র রমযানে তেজগাঁও জামা'তের বেশ কয়েকজন পবিত্র কুরআন পাঠ শেষ করেন।

মোহাম্মদ আবদুল ওয়াদুদ

দোয়ার আবেদন

সৈয়দ শামস্ শাহাবউদ্দীন সাদ, পিতা-সৈয়দ শরীফ আহমদ, মাতা-নাসিরা শরীফ, দাদা-মৃত সৈয়দ খাজা আহমদ এবং নানা মৃত ফকির মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী। ডি-৩৪ জাকির হোসেন রোড, মোহাম্মদপুর ঢাকা-১২০৭। সে এমবিএ উচ্চ শিক্ষার জন্য আমেরিকার ওহাই গিয়েছেন, তার উচ্চ শিক্ষার জন্য জামা'তের সকল ভাইবোনদের নিকট খাস দোয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি।

সৈয়দ শরীফ আহমদ

কৃতি ছাত্রী

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তেজগাঁও-এর ভাইসপ্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী ফাইনান্স মোহাম্মদ আবদুস সালাম-এর প্রথম মেয়ে ***আমাতুল রাফে*** ২০১৩ সনের এইচ, এস, সি পরীক্ষায় হলিক্রস কলেজ থেকে GPA-5 পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। সে তেজগাঁও জামা'তের সাবেক প্রেসিডেন্ট জনাব ডা. এম, এ, রশীদ-এর নাতনী এবং সাংবাদিক মরহুম সৈয়দ আব্দুল কাহ্হার-এর দৌহিত্রী। সে তার রূহানী, উচ্চ শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ সর্বাঙ্গিন উন্নতির জন্য জামা'তের সকল ভ্রাতা ভগ্নীর নিকট দোয়াপ্রার্থী।

মাতা-সৈয়দা ফারহানা আহমদ
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তেজগাঁও, ঢাকা

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী

১ প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোযা রাখুন। এজন্যে প্রত্যেক জামাতে স্থানীয়ভাবে মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত করে নিন।

২ প্রত্যেকদিন দু' রাকাআত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত অথবা যুহরের নামাজের পর) আদায় করুন।

৩ সূরা ফাতিহা কমপক্ষে প্রত্যহ সাতবার পাঠ করুন।

৪ রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন [সূরা বাকারা ঃ ২৫১] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫ রাব্বানা লা তুযিগ কুলূবানা বা'দা ইয্ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্'হাব [সূরা আলে ইমরান– ৯] প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

৬ আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম [আবূ দাউদ ঃ কিতাবুস সালাত] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা [অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়] তোমাকে তাদের অন্তরে [ঢালস্বরূপ] রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭ আস্‌তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়াআতুবু ইলায়হে। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহতাআলার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

৮ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রশংসাসহ অতি পবিত্র। তিনি অতি পবিত্র অতি মহান। হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৯ দুরূদ শরীফ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

হুযূর (আই.)-এর এই আহ্বান বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় জামাত ও জামাতের সমস্ত অঙ্গ সংগঠনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষীকি জুবিলী ২০১৩ ন্যাশনাল কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং
আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

New Vol. No. **76** | 4th Issue

The Ahmadi
Fortnightly

31st August, 2013 Tk. 18.00
Regd. No. D. A.-12

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com